শপথ নিলাম

শৈলেশ দে

পূর্ণ প্রকাশন

৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৮এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৭১

প্রচ্ছদ :
শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
রতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

কল্যাণীয়া

তপতী গুপ্তভায়াকে

ভুল করে অপর একজন সাহেব-হত্যা করেও শহীদ গোপীনাথ সাহা বিপ্লব-ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছেন। তার কারণ, কৃতকার্যতাই এসব ক্ষেত্রে বড় কথা নয়—বিপ্লবের টেক্‌নিকে ও আদর্শে সংঘটিত 'অ্যাকসন'ই বড় কথা। অবশ্য সে-অ্যাকসনটি যদি রাজনৈতিক-গুরুত্বে ওজনদার হয়, তবে তো সোনায় সোহাগা!···

'বেণু'-অফিসেই বসে আছি।···মনে মনে ভাবছি যে, এতক্ষণে পুলিস নিশ্চয় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে সারা কলকাতার বুকে, আততায়ীদের কল্পিত ছায়ার পশ্চাতে।···পনেরো-বিশ মিনিট হয়তো ইতিমধ্যে কেটে গেছে। সহসা দেখি, বিরাট এক পুলিস-ভ্যান্ ও এক ট্রাক্ সশস্ত্র-পুলিস আমাদের দোরগোড়ায় হাজির। সশস্ত্র-বাহিনী ঘিরে ফেলল বাড়ি-ঘর। কয়েকজন রাইফেলধারী-সেপাই এবং দু-তিনটি সার্জেণ্টসহ ঢুকলেন এক পুলিস-কর্তা 'বেণু'-অফিসে। ঘর-বাড়ি তচ্‌নচ্ করে সার্চ করা হল। পেল না কিছুই। না বোমা-পিস্তল, না আততায়ীদের ছায়া।

ডালহৌসী স্কোয়ারে সংঘটিত-টেগার্ট আক্রমণের দিনটি এসব কারণে আজও আমার কাছে সেদিনকার ঘটনা হয়ে আছে।···

এই যে ঘটনা—এর ইম্‌প্যাক্ট ও রাজনীতিক-গুরুত্ব সেদিনকার পরিস্থিতিতে ছিল অসাধারণ। শহর কলকাতা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-'ক্যাপিটেল্'; সাম্রাজ্যবাদিক-শাসনের 'সিটাডলে্'। দিনে দুপুরে এই শহরের জনাকীর্ণ ডালহৌসী স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এই অভিযান সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি তো আকর্ষণ করবেই। কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তি যখন স্যার চার্লস টেগার্ট, তখন সেই বৃহৎ কাণ্ড আকর্ষণ করবে নিশ্চয় সারা পৃথিবীর দৃষ্টিও।

চট্টগ্রামের পরই ডালহৌসী স্কোয়ার। এ দুর্জয় সংঘটনার নায়ক কে? কি তাঁর পরিচয়? কারা তাঁর সঙ্গী? কেমন করে এই ব্রত পালনে তিনি উৎসুক হলেন? কোথায় তাঁর শিক্ষা? সংগোপনে কঠিন বিপ্লবের পথে অমন দুঃসাহসী অ্যাকসনের প্রস্তুতি

তিনি কিভাবে করলেন ? এ ধারার অজস্র প্রশ্ন দেশবাসীর মনে আসবে। কিশোর ও তরুণদের জিজ্ঞাসু-নয়নে এসব প্রশ্নের ছায়া পড়বে।

কিন্তু প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কারো এ ধারার ঔৎসুক্য মেটাবার সুযোগ হত না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও বহুকাল বিপ্লবের কাহিনী ব্যক্ত করার তেমন তাগিদ বিপ্লবীদেরও দেখিনি। অবশ্য সুখের বিষয় যে, বর্তমানে কোন কোন ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এদিকে প্রসারিত হয়েছে। অনেক তরুণ-গবেষক সরকারী-আর্কাইভ্স্ ঘেঁটে বিপ্লব-যুগের তথ্যাদি উদ্‌ঘাটনে আগ্রহান্বিত হচ্ছেন। কিছু লেখকও এগিয়ে আসছেন ইতিহাস-নির্ভর করে বিপ্লবী-চরিত্র নিয়ে সাহিত্য-রচনার সঙ্কল্পে। 'শপথ নিলাম' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীশৈলেশ দে শেষোক্তদের অন্যতম

শৈলের দে-র গ্রন্থ পড়ে বর্তমানের ছেলেমেয়েরা জানতে পারবেন যে, আজ থেকে ঠিক চল্লিশ বছর পূর্বে ঐ 'বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগে' টেগার্ট সাহেবকে যাঁরা হত্যা করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদেরই নায়ক ছিলেন দীনেশচন্দ্র মজুমদার। সে অভিযানে বোমা-বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই যাঁর শহীদের মৃত্যু হয়েছিল তিনি হলেন অনুজা সেন।

দীনেশ মজুমদারের কর্ম-কাহিনী শুধু ডালহৌসী-অ্যাকসনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর ব্যাপক কর্মকথা এই গ্রন্থে বিবৃত করে শৈলেশবাবু জিজ্ঞাসুদের উপকার করলেন। শৈলেশবাবু কোনকালে কোন বিপ্লবীদের সভ্য ছিলেন না। কিন্তু হৃদয়ের তাগিদে বিপ্লবীদলের কর্মশালার দ্বারে উঁকি দিতে গিয়ে তিনি সম্মোহিত হলেন। আর ফিরবার পথ নেই। বিপ্লব-কাহিনীর মাল-মসলা সম্বল করে তাই লিখে যেতে হচ্ছে তাঁকে নিত্যনতুন গ্রন্থ। তাঁর মস্ত সুবিধে,—তিনি এ-কালের কণ্ঠে কথা বলতে জানেন, এ-কালের ছেলেমেয়েদের ভাষায় আপন বক্তব্য পরিবেশন করতে পারেন.।

অধিকন্তু অগ্নিযুগের গোপন তথ্য সংগ্রহ শুধু নয়—বিপ্লববাদ ও বিপ্লবীদের চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম হবার শিক্ষা তিনি আহরণ করেছেন প্রচুর নিষ্ঠা, পরিশ্রম, শ্রদ্ধা ও পড়াশোনার মাধ্যমে।

কাজেই তাঁর এ-গ্রন্থ একদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

আমি আশা করি তাঁর 'আমি সুভাষ বলছি', 'বিনয়-বাদল-দীনেশ', 'ক্ষমা নেই' বা 'ফাঁসি মঞ্চ থেকে' গ্রন্থের মতই আলোচ্য গ্রন্থও বাঙলার যুব-সমাজে সবিশেষ সমাদর লাভ করবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

শহীদের অমর মরণের সার্থকতা যাঁরা অর্জন করেছেন, সংগঠকও তাঁরা হতে পেরেছেন—এমন সুযোগ বাংলার সেই বিপ্লবীযুগে যতীন্দ্রনাথ, সূর্য সেন ছাড়া কম কর্মীই পেয়েছেন। যতীন্দ্রমোহন রায়ের পাশে থেকে বগুড়ায়, আর সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় দীনেশ সংগঠনের কাজ করে। নিজ নেতৃত্বে সংগঠনের কাজ তার ১৯৩২ সালে জেল থেকে পালিয়ে এসে। অনুজা সেন যেদিন তাকে যুগান্তরের দীক্ষায় দীক্ষিত করে সেইদিনই তার মানুষ ও বস্তুর মর্মভেদী দৃষ্টি নির্ভুল দেখে নিয়েছিল দেহ-প্রাণ-মন, ইহকাল পরকাল তার দেশের কাজে, মানবসেবায় সমর্পিত। •তার মৃদুহাসির ভিতর সে ঝঞ্ঝার বেগ সঞ্চয় করল। ঝঞ্ঝার কাছে দ্বীপান্তর, কারাপ্রাচীর, ব্যর্থতা, মৃত্যু—সবই অর্থহীন। ঝঞ্ঝারই বেগে চলেছে সে। অসম শক্তিতে, অতুলনীয় কৌশলে দুজন সাথী নিয়ে কারাপ্রাচীর ডিঙাল। তখন তার স্বপ্ন—কলকাতার দখল নিতে হবে। অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই। শত্রু প্রবল। তাদের ধ্বংস করতে হবে। ওয়াটসনকে হত্যার চেষ্টা দু-দুবার। চন্দননগরের পুলিস কমিশনারকে হত্যা। পলাতক জীবনে কয়লা-খনিতে কুলিগিরির বিচিত্র বিপদ আর দৈন্যকে উপেক্ষা। গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কের অর্থ অপসারণ। অবশেষে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে অপর দুজন সঙ্গীসহ অগণিত পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ। তারপর ফাঁসি। ঝঞ্ঝার জীবনের সেখানেই অবসান।

'তা যদি হবে, তবে অন্তরের কি আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো।
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।'

শাণিত ছুরির ফলকের মতো দৃষ্টি অনুজাকে যিনি দেখেছেন, আজও তাঁর স্মরণে আসবে, প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তার অন্তরের কোন প্রেরণায় চালিত। অমলিন হাসিতে উজ্জ্বল প্রতিটি কথা তার যেন সেই প্রেরণায় স্ফুরণ। সে কথায় সহজেই তাই তরুণদের আকর্ষণ করত। খুলনায় সেনহাটিতে নিজ গ্রামে, রংপুরের গাইবাঁধায়, কলকাতায় কত তরুণ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যুগান্তরের আত্মবলিদানের দীক্ষামন্ত্র নিতে। প্রকৃতির মতো কার্পণ্য-হীন চমকপ্রদ কিছুর জন্যেই নিজেকে সঞ্চিত রাখতে হবে—এমন কথা নেই। মানবসেবা চমকপ্রদ নয়, আত্মদান তাতেও সার্থক। নিজের দীক্ষাদাতা রসিকলাল দাসের পাশে বসে প্রাচীন হোতাদের অন্যতম যক্ষ্মারোগী শৈলেশ্বর বোসের শেষশয্যায় শুশ্রূষার ভার নিয়েছে। আবার যখন ভার পড়ল স্যার চার্লস টেগার্টকে বোমার আঘাতে নিঃশেষ করতে হবে, আগ্রহে উৎসাহে সমানই দৃপ্ত। শত্রুকে নিঃশেষ করতে না পেরে নিজের শেষ বিন্দু রক্তকণা লালদিঘীর জলে

মিশিয়ে দিয়ে সমানই তৃপ্তিতে জীবনের চরম সার্থকতা অর্জন করে গেল। নিজ জীবন দিয়ে মানব-জীবনের জন্যে যারা সম্বল সঞ্চয় করে গেল, তাদের দিব্যমণ্ডলাতে মানবের চিরপ্রীতির আসনে অস্কুজার স্থানও অক্ষয় থাকবে।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

…অনুজাচরণের বুকের যে রক্তধারা সেদিন ডালহৌসী স্কোয়ারকে রঞ্জিত করেছিল, তা বৃথা যায়নি। দেখতে দেখতে সারা বাংলাদেশের বিপ্লবীদের ধমণীর রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল।…এক হাতে অস্ত্র আরেক হাতে প্রাণ নিয়ে তারা শত্রুর সঙ্গে গেরিলাযুদ্ধে মেতেছে। দীর্ঘ চারটি বছর ধরে এই গেরিলাযুদ্ধ তারা চালিয়েছে অক্লান্তভাবে।

এই স্বাধীনতা সংগ্রামে কত অমূল্য প্রাণ নিজেকে বলি দিয়ে দেশ ও জাতিকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ রেখে গেছে, তা কি আমরা কখনো ভুলতে পারি ?

রসিকলাল দাস

স্নেহের ভাই শৈলেশবাবু,

আপনি শহীদ দীনেশ মজুমদার সম্বন্ধে কিছু জানাতে বলেছেন। নিশ্চয়ই জানাব।…কবেকার কথা, তবু সেই মহান বিপ্লবীর কথা মনে হলে আজো আনন্দ, বেদনা ও গর্বে মাথাটা নুয়ে আসে বার বার।…

কল্যাণী ভট্টাচার্য (দাস)

সবকিছুই ঘটেছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে।

এর কোন নিজস্ব রেকর্ড নেই। কোন লিখিত ইতিহাসও নেই। শুধু সাক্ষী হিসেবে বেঁচে রয়েছেন সেদিনের অশেষ নির্যাতনভোগী কতগুলি মানুষ, যাঁদের বুকে আজো সবকিছুই লেখা রয়েছে রক্তের অক্ষরে। তাছাড়া আর কিছুই নেই।

কেন নেই? জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন বিপ্লবী-তিলক পরম-শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ। তিনি বলেছেন:

'যাঁহারা প্রচণ্ড ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন যথার্থ স্বাধীনতা কাড়িয়া লইবার বীর্যে, তাঁহাদের অমর কর্মকাণ্ডের অধিকাংশ সকলের অজ্ঞাতে আচরিত হইয়াছে। সভা-সমিতি ডাকিয়া জ্বালাময়ী প্রস্তাব গাঁথিয়া কোন কার্য সাধিত হয় নাই। প্রস্তর-ফলকে বা তাম্র-রৌপ্য মুদ্রায় কোন কীর্তি-কাহিনী কেহ লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। অথবা কোন সাক্ষী-সাবুদ ডাকিয়াও কোন গুপ্ত-সমিতির লোকেরা তাঁহাদের কার্যকলাপ সংঘটিত করেন নাই। কাজেই তাঁহাদের কর্ম ইতিহাস-দুর্লভ।'

সত্যিই দুর্লভ। শুধু দুর্লভ নয়, প্রকৃতপক্ষে সেদিন কি ঘটেছিল, সবার অলক্ষ্যে কোথায় কার কতখানি রক্ত ঝরেছিল, দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে তার সঠিক মূল্যায়ন করাটা প্রায় অসম্ভবও বলা চলে।

তবু চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। হয়তো তা সত্ত্বেও কোথাও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। থাকাটাই স্বাভাবিক। সহৃদয়

পাঠক-পাঠিকা ও বিপ্লবী বন্ধুগণ সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন আশা করি।

১৯৬৬ সালের বৈশাখ-সংখ্যায় লেখাটি সর্বপ্রথম 'দধীচি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকায়। 'শপথ নিলাম' তারই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ।

এ প্রসঙ্গে বার বার স্মরণ করি শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, কমলা দাশগুপ্তা, কল্যাণী ভট্টাচার্য (দাঃ) প্রমুখ বিপ্লবী নায়ক-নায়িকাদের কথা। তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে এ বই লেখা হয়তো কোনদিনই সম্ভব হত না। পুলিস দপ্তর থেকে সংগৃহীত কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি পরিবেশন করেছেন— 'বিপ্লবী নিকেতন'। এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

বিনীত

গ্রন্থকার

২১বি, ফার্ণ রোড,
কলিকাতা-১৯

২রা এপ্রিল, ১৯৭০ সাল

গ্রন্থ-ঋণ

গ্রন্থ	লেখক
ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়
সবার অলক্ষ্যে	,,
রক্তের অক্ষরে	কমলা দাশগুপ্তা
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী	,,
জীবন অধ্যয়ন	কল্যাণী ভট্টাচার্য (দাস)
ইতিহাসের উপাদান (সাপ্তাহিক বসুমতী)	ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
ডালহৌসী স্কোয়ার ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত (উল্টোরথ)	যতীশ ভৌমিক
শহীদ অনুজাচরণ সেন ,,	রসিকলাল দাস
শহীদ দীনেশ মজুমদার ,,	কল্যাণী ভট্টাচার্য (দাস)
বাংলায় বিপ্লববাদ	নলিনীকিশোর গুহ

আনন্দবাজার পত্রিকা : ভারতবর্ষ : সাপ্তাহিক বসুমতী ও উল্টোরথ

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

আমি সুভাষ বলছি
বিনয়-বাদল-দীনেশ
ক্ষমা নেই
ফাঁসি-মঞ্চ থেকে
রক্তের অক্ষরে
ও
অন্যান্য

দীনেশ মজুমদার

অনুজা সেন

অতুল সেন
(পুলিশ দপ্তরে রক্ষিত ছবি)

অনিল ভাদুড়ী
(পুলিশ দপ্তরে রক্ষিত ছবি)

মণীন্দ্র লাহিড়ী
(পুলিশ দপ্তরে রক্ষিত ছবি)

কমলা দাশগুপ্তা

কল্যাণী ভট্টাচার্য্য (দাস)

জ্যোতিকণা দত্ত (বেবী)

বীণা ভৌমিক (দাস)

সুহাসিনী গাঙ্গুলী (পুঁটুদি)

ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত

রসিক দাস
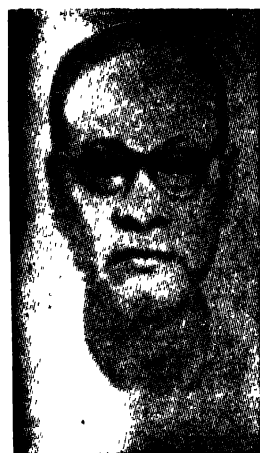
মনোরঞ্জন গুপ্ত

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

আর দশ মিনিট বাকি। তারপরই সে আসবে।

আবার পায়চারি শুরু করলেন ওঁরা দুজন। কোন কথা নয়। কোন কাজ নয়। শুধু প্রতীক্ষা। স্তব্ধ প্রতীক্ষা ছাড়া আপাতত আর কোন কাজ নেই ওঁদের।

জনাকীর্ণ ডালহৌসী স্কোয়ার। চারিদিকে লোকজনের কর্ম-ব্যস্ততা। জনতার কোলাহল আর ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির আওয়াজে মুখর হয়ে উঠেছে গোটা অঞ্চলটা।

ওঁরা নির্বিকার। এই কর্মব্যস্ততার সঙ্গে ওঁদের এতটুকুও যোগ-সূত্র নেই। যেন পথ ভুলে কোন অচেনা জগতে এসে পড়েছেন ওঁরা।

আরো পাঁচ মিনিট বাকি। তারপরই সে আসবে।

আবার সেই পায়চারি। সেই প্রতীক্ষা।

কখন আসবে সে? কখন? প্রহরগুলো যেন কাটতেই চায় না।

আর এক মিনিট। মাত্র এক মিনিট। তারপরই সে আসবে। আসবেই! কোনদিন তার ব্যতিক্রম হয়নি। আজও হবে না।

ঐ—ঐ যে সে এসেছে। ঐ যে দূরে তার পরিচিত গাড়িটা বাঁক নিয়েছে। আর দেরি নেই। এল বলে!

নিমেষে প্রস্তুত হয়ে নিলেন ওঁরা দুজন। এসেছে। এসেছে। জীবনের পরম লগ্ন এগিয়ে এসেছে। এ সুযোগ হারালে চলবে না।

জিরো-আওয়ার। রেডি! অ্যাকসন প্লীজ! ওয়ান-টু-থ্রি! কুইক!

বুম্! বুম্! বু-বুম্! বুম্-ম্-ম্-ম্-ম্!

নিমেষে গোটা ডালহৌসী স্কোয়ারটা কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের

শব্দে। কেঁপে উঠল মহানগরীর বুক; কেঁপে উঠল পররাজ্যলোভী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্ত বনিয়াদ।

কি হল কিছুই বোঝা গেল না। কিছুই দেখা গেল না। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। সবকিছু ঢাকা পড়ে গেল নিশ্ছিদ্র কালো ধোঁয়ার অন্তরালে।

সেই ১৯৩০ সালের আর একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। বিশ্বাসের অযোগ্য এক কাহিনী।

শোন মল্লিকা, কান পেতে শোন। শুনতে পাচ্ছ কিছু মাটির বুকে?

শুনতে পাচ্ছ, কাদের যেন ফিসফিস চাপা গুঞ্জন আর ভারি দীর্ঘশ্বাস!

ইতিহাস। ইতিহাস কথা বলছে। কথা বলছে মৌন অতীত। সেই বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের ধূসর পাণ্ডুলিপি।

প্রণাম কর এই ইতিহাসকে।

প্রণাম কর শত শহীদের রক্তে রাঙা এই বাংলাদেশের মাটিকে, যার প্রতিটি স্তূপের নিচে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে কত নাম-না-জানা মানুষ, কত চাপা কান্না, কত অশ্রু, কত চক্রান্ত, শোষণ আর কারাবাসের কাহিনী।

প্রণাম কর এই ইতিহাসের নায়ক, দধীচি দীনেশকে, যাঁর প্রতিটি রক্তকণা সেদিন শতধারায় ফেটে পড়েছিল তীব্র প্রতিবাদে।

প্রণাম কর সেদিনের সেই দুঃসাহসী নারীদের, যাঁরা হাজার প্রতিকূলতা ঠেলেও সেদিন উন্মত্ত আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। সবাইকে প্রণাম কর।

আজ তোমাকে দীনেশের কথা বলব মল্লিকা। তাঁর ঘাত-

প্রতিঘাতে ভরা রোমাঞ্চকর জীবন-নাট্যের সব কথাই আজ তোমাকে শোনাব রাত্রির এই নিঃসঙ্গ প্রহরে।

কিন্তু মনের ওপর অনেক ধুলো জমেছে।

কত চেনা মানুষের মুখ আজ ভিড়ে হারিয়ে গেছে। কত নাম। কত ভুলে-যাওয়া মুখ।

তাঁদের কেউ শাস্তি ভোগ করেছেন লোহকারার অন্তরালে। কেউ গেছেন দ্বীপান্তরে। কেউ বা দণ্ডিত হয়েছেন প্রাণদণ্ডে।

আজ আর সে-সব কথা ভাল করে মনেও পড়ে না। নিরিবিলি ঘরের কোণে অতীতের ঝাঁপি থেকে স্মৃতির হীরে-মুক্তো দেখতে দেখতে কখনো চোখদুটো ঝাপসা হয়ে উঠলেও বাস্তব সংসারে আজ তার এতটুকুও দাম নেই।

কর্মব্যস্ত জীবনে স্মৃতি-রোমন্থনের অবকাশ কোথায়?

তবু দীনেশকে ভুলিনি। তাঁকে ভোলা যায় না। সেই অনুপম মুখের মন-ভোলানো হাসিটুকু কোনদিনই বুঝি ভোলা সম্ভব নয়।

দীনেশ গুপ্ত নয়, দীনেশ মজুমদার। দীনেশ গুপ্ত আলাদা লোক। রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানকারী বীর বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের কথা এর আগেই তোমাকে শুনিয়েছি 'আমি সুভাষ বলছি' গ্রন্থের মাধ্যমে।

ইনি দীনেশ মজুমদার। রামমোহন রায় রোডের সাত নম্বর বাড়ির দীনেশ মজুমদার।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্দান্ত লাঠিয়াল দীনেশ মজুমদার। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র দীনেশ মজুমদার। ছাত্রীসঙ্ঘের শিক্ষাগুরু দীনেশ মজুমদার। এ-যুগের সব্যসাচী দীনেশ মজুমদার একাই যেন গোটা একটা ইতিহাস।

জন্ম হয়েছিল বাংলা ১৩১৪ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ, বসিরহাটের বাজারপাড়ায়।

চার ভাই। অবিনাশ, দীনেশ, ভবেশ ও প্রকাশ। দীনেশ দ্বিতীয়।

বাবা পূর্ণচন্দ্র মজুমদার ছিলেন নির্বিকার মানুষ।

এমন আশ্চর্য নির্বিকার মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। কাউকে কিছু বলেন না। কারোর কোন কাজে কখনো বাধাও দেন না। সংসারে থেকেও যেন তিনি নেই।

হয়তো এমনি করেই কায়-ক্লেশে দিন চলে যেত, কিন্তু তা আর হল না।

হঠাৎ একদিন বিপর্যয় নেমে এল গোটা সংসারটার ওপর। মাত্র দিনকয়েক রোগভোগ করে তিনি চোখ বুজলেন চিরদিনের মত।

অকুল পাথারে পড়লেন স্ত্রী বিনোদিনী দেবী। হাতে পুঁজি-পাতি যা ছিল স্বামীর অসুখের সময় সবই খরচ হয়ে গেছে। কোথায় যাবেন তিনি এখন এই ছোট ছোট শিশুগুলোকে নিয়ে!

সুমুখের পানে তাকাতে গেলে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই যে নজরে পড়ে না।

দীনেশ অবাক। তাই তো! বাবা কোথায় গেলেন! মা-ই বা হঠাৎ এমন করে মাছ খাওয়া ছেড়ে দিলেন কেন! কি ব্যাপার?

—তুমি মাছ খাচ্ছ না কেন মা? দীনেশের প্রশ্ন।

—আমাকে মাছ খেতে নেই বাবা। চোখের জল গোপন করলেন বিনোদিনী দেবী।

—নেই কেন? দীনেশ অবাক।

—বাবা মারা গেলে মাকে মাছ খেতে নেই।

—নেই বুঝি! সঙ্গে সঙ্গে নিজের অভিমত জানাল দীনেশ, তাহলে আমিও আজ থেকে মাছ খাব না।

—ছিঃ! অমন কথা বলতে নেই। তুমি কেন খাবে না? নিশ্চয় খাবে।

—কি করে খাব? মায়ের দিকে তাকিয়ে ছলছল চোখে জবাব দিল দীনেশ, তুমি খাচ্ছ না যে!

ভাবতে পার মল্লিকা! মাছ ছিল যাঁর একান্ত প্রিয়, সেদিন এককথায় তিনি তা ছেড়ে দিলেন চিরদিনের জন্য। হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও জীবনে আর কোনদিনই তিনি তা স্পর্শ করেননি।

কি করে করবেন! মা যে তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান সব কিছু। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

অথচ কতই বা সেদিন বয়েস ছিল দীনেশের! ছ' বছরের অপরিণত শিশুমাত্র।

বিপদ যেন একটার পর একটা তোলাই ছিল।

হঠাৎ একদিন চৌকিদার এসে হাজির। অনেক টাকা খাজনা বাকি পড়েছে। অবিলম্বে মিটিয়ে না দিলে বাড়ি-ঘর সব ক্রোক হয়ে যাবে।

কোন কথাই যোগাল না বিনোদিনী দেবীর মুখ দিয়ে। কি বলবেন! চোখের সামনে অন্ধকারের তরল স্রোত। তিল তিল করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে পায়ের নিচের মাটি। চারিদিকে অথৈ জল। কোথাও কূল নেই।

—লোকটা কি বলে গেল মা? পায়ে পায়ে এগিয়ে এল দীনেশ।

—সরকার বাহাদুরের খাজনার টাকা বাকি পড়েছে কিনা, তাই বললে।

—সরকার বাহাদুর! দীনেশ অবাক, সরকার বাহাদুর কে মা?

—ইংরেজ সরকার। তারাই এ-দেশের মালিক কিনা!

—কেন? বিস্ময়ের যেন সীমা থাকে না দীনেশের, এ-দেশ তো আমাদের। তাহলে ইংরেজ তার মালিক হবে কেন?

—ওরা আমাদের দেশ দখল করে নিয়েছে যে।

—দখল করে নিয়েছে! চোখে বুঝি পলক পড়ে না দীনেশের, কেন দখল করে নিলে?

—বড় হলে জানতে পারবে। যাও, এখন বই নিয়ে বস গে।

তখনকার মত চুপ করে গেলেও একটা ব্যাকুল জিজ্ঞাসা কিন্তু

শিশুমনে জেগেই রইল সর্বক্ষণ। এ-দেশ আমাদের। ইংরেজ আমাদের দেশ দখল করবে কেন? কেন? কেন?

পৃথিবী কারো মুখ চেয়ে তার চলার গতি বন্ধ করে না। তবু দিন কাটে। তবু দিনের পর রাত্রি আসে। রাত্রিও আবার একসময়ে শেষ হয় নতুন আলোর সমারোহে।

ভেবে ভেবে কোনই কূল-কিনারা পান না বিনোদিনী দেবী। কি করবেন তিনি এখন এই শিশুগুলোকে নিয়ে? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন? শেষ সম্বল এই বসতবাটিটুকু গেলে আর কিছুই যে অবশিষ্ট থাকবে না!

ভাবনা দীনেশের কম নয়, তাই এবার সে ধরে বসল বড়ভাই অবিনাশ মজুমদারকে।

—আচ্ছা দাদা, এ দেশ তো আমাদের। তাহলে ইংরেজকে আমরা টাকা দেব কেন?

—তা দিতে হবে বৈকি! হেসে জবাব দিলেন বড়ভাই অবিনাশবাবু, ওরাই এখন এ-দেশের মালিক যে!

—কেন? প্রতিবাদ জানায় দীনেশ, ওরা আমাদের দেশের মালিক হবে কেন?

—তাই তো! হা-হা করে হেসে উঠলেন অবিনাশবাবু. কঠিন প্রশ্ন! তা, আমি তো তোমার এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না ভাই। আগে বড় হও, তারপর ইতিহাস পড়লেই সব জানতে পারবে।

শুরু হল ছাত্র-জীবন। সকালে পড়াশোনা, দুপুরে স্কুল, রাত্রে বাড়ি।

তারই ফাঁকে ফাঁকে শিশুমনকে চঞ্চল করে তোলে সেই একই প্রশ্ন। ইংরেজ আমাদের দেশ দখল করবে কেন?

ওদের তো আলাদা দেশ রয়েছে। কই, আমরা তো ওদের দেশ দখল করিনি! তাহলে কেন ওরা আমাদের দেশে থাকবে?

জবাব মেলে না। এমন কি মাস্টারমশাইও এই ব্যাকুল জিজ্ঞাসার কোন জবাব দিতে পারেন না। তিনিও বলেন, আগে বড় হও। তারপর সব জানতে পারবে!

সেজভাই ভবেশ বয়সে কিছুটা ছোট। শিশুসুলভ বুদ্ধি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সে জবাব দেয়, আমি কিন্তু বলতে পারি মেনিদা। ওরা ভীষণ পাজী লোক কিনা—তাই!

মেনি দীনেশের ডাক নাম। চেনা-জানা মহলে এই নামেই সে পরিচিত।

কয়েকদিন চুপচাপ। তারপরই একদিন কি ভেবে প্রশ্ন করে দীনেশ।

—ওরা কবে আমাদের দেশ থেকে চলে যাবে মাস্টারমশাই?

—কে বলতে পারে! এত বড় জমিদারী ফেলে কেউ কি আর সাধ করে চলে যায় কখনো?

—ঈস্, যাবে না! আহ্লাদ নাকি! কক্ষণো ওরা আমাদের দেশে থাকতে পারবে না। ওদের যেতেই হবে।

—আর যদি না যেতে চায়? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন মাস্টার-মশাই।

অনেক ভেবেও প্রশ্নটার কোন উত্তর খুঁজে পায় না দীনেশ। কি যেন একটা গলার কাছ অবধি এসে আটকে যায়, কিন্তু বেরোবার পথ পায় না।

দিন কাটে। আপনভোলা শিশু বড় হতে থাকে।

সেদিন ছিল কালীপুজো। পার্শ্বচর ভবেশকে নিয়ে সকাল

থেকেই দীনেশ মহাব্যস্ত। বাজী তৈরি করতে হবে। অনেক রকম বাজী।

—এটা কি জিনিস মেনিদা? হঠাৎ প্রশ্ন করে ভবেশ।

—এটা কালীপট্‌কা। কাজ করতে করতেই জবাব দেয় দীনেশ।

—আর ওটা? আবার প্রশ্ন করে ভবেশ।

—ওটা ঢাউস্ বোমা। দেখবি কি আওয়াজ? তাহলে সরে দাঁড়া। উঁহু, এভাবে দাঁড়ালে চলবে না। কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়া। নইলে পর্দা ফেটে যাবে। শীগ্‌গির সরে যা। পলতেয় আগুন দিয়েছি কিন্তু!

বুম্! বুম্! বুম্-ম্-ম্-ম্! নিমেষে থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা বাড়িটা। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল হৈ-চৈ, চিৎকার আর চেঁচামেচি। কি হল! কি হল!

সর্বাগ্রে ছুটে এলেন মা বিনোদিনী দেবী। ছুটে এলেন বাড়ির প্রতিটি প্রাণী।

কোথায় কি? কেউ নেই কাছে-কিনারে। আসামীরা উধাও। শুধু পড়ে আছে বারুদের উৎকট গন্ধ আর রাশি রাশি ধোঁয়া। তাছাড়া আর কিছুই নেই।

এমনি করে দিন-মাস-বছরের মালা-গাঁথা ছন্দে শৈশব কাটিয়ে কৈশোর।

মনে কতরকম ভাবনা। কত সবুজ কল্পনা। তবু নিজের প্রতিজ্ঞায় দীনেশ স্থির, অচঞ্চল।

মা বলেছেন, 'বড় হতে হবে।' দাদাও বলেছেন তাই। তাঁদের এই একান্ত সাধকে পূর্ণ করতেই হবে। কোনরকমেই পিছিয়ে থাকলে চলবে না।

স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেল ১৯২৪ সালে। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে দীনেশ সেবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন বসিরহাট হাইস্কুল থেকে।

এবার কলকাতায়। আশ্রয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। সাত নম্বর রামমোহন রায় রোডে জ্যেঠামণি হরিমোহন মজুমদারের নিজের বাড়ি রয়েছে। ওখানে থেকে কলেজে পড়তে কোনই অসুবিধে নেই।

শুধু দীনেশ বলে নয়, সেদিন দু-বাড়ির প্রতিটি ছেলের জন্য ছিল হরিমোহনবাবুর এই একই ব্যবস্থা। অর্থাৎ, আগে এখানে থেকে স্কুলের পড়া শেষ কর, তারপর সোজা চলে যাও আমার কলকাতার বাড়িতে।

একতলা দোতলায় ভাড়াটে থাকলেও গোটা তিনতলাটা তো খালিই পড়ে রয়েছে। ওখানেই গিয়ে তোমরা দিব্বি পড়াশোনা কর ঠাকুর-চাকর নিয়ে।

'আমি বড় হব।'

আবার প্রমাণ মিলল দু-বছর বাদে। সসম্মানে দীনেশ সেবার আই.এস্‌সি. পাস করলেন সিটি কলেজ থেকে। তারপর বি.এস্‌সি.। এবারও যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট।

এখানেই থামলেন না দীনেশ। এবার তিনি ভর্তি হলেন ল' ক্লাসে। আরো বড় হতে হবে। অনেক বড়।

পুত্রগর্বে আনন্দে চোখে জল দেখা দেয় মা বিনোদিনী দেবীর। আহা, মেনি আমার বড় ভাল ছেলে। সে আরো বড় হোক। হিমালয়ের মতই সে আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোক।

দাদার শুভেচ্ছা ও মায়ের এই আশীর্বাদ দীনেশ অক্ষরে অক্ষরে সার্থক করে তুলেছিলেন, মল্লিকা। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এমনি করে। সে-কথাই এখন তোমাকে বলব।

বাংলার দিকে দিকে তখন নবজীবনের সাড়া। নতুন দিনের সঙ্কেত। আর সময় নেই। এবার প্রস্তুত হবার পালা।

দীনেশও সে আহ্বান শুনেছেন। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন।

শৈশব থেকেই মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন যে, ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। আবেদন-নিবেদন করেও নয়। তার জন্য মূল্য দিতে হয়। অনেক মূল্য।

মূল্য তিনিও দিতে প্রস্তুত। যে-কোনরকম মূল্য।

তবে তার আগে আঘাত হানতে হবে। এমন শক্ত আঘাত হানতে হবে, যার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতটা পর্যন্ত যেন কেঁপে ওঠে।

তার জন্য নিজেকে প্রস্তুতও তিনি করেছেন যথোপযুক্তভাবে। প্রস্তুত করেছেন দেহ ও মন উভয় দিক থেকেই।

সত্যিই তাই। এ যেন আগেকার দেখা সেই দীনেশ নন। মনে হয় আমূল পরিবর্তিত কোন ভিন্ন সত্তা।

দেহে যৌবনের দুর্বার গতিছন্দ। চোখে-মুখে সতেজ দীপ্ত ভঙ্গী। স্বাস্থ্য ও শক্তিতে ভরপুর এক প্রাণবন্ত যুবক।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর লাঠি।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির ওস্তাদ লাঠিয়াল দীনেশকে তখন কে না সমীহ করে! কার সাধ্য হাতে একখানা লাঠি থাকলে তাঁর সামনে এগোয়!

বিশেষ করে পাশে যদি বন্ধু অনুজা সেন থাকেন তো কথাই নেই। দু-পাঁচশো লোকের মহড়া নেওয়াও তখন তাঁর পক্ষে একটা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রমাণ পাওয়া গেল একবার প্রতিমা-নিরঞ্জনের ব্যাপারে।

মাঝপথে হঠাৎ সেবার রুখে দাঁড়াল শত শত স্বভাব-দুর্বৃত্তের দল। এ পথে তারা শোভাযাত্রা যেতে দিতে রাজি নয়।

কত অনুরোধ, কত মিনতি, তবু তাদের সেই এক গোঁ। জান যায় সেভি আচ্ছা, তবু রাস্তা নেহি ছোড়ে গা।

নিমেষে বন্ বন্ করে ঘুরে উঠল তুখানি মাত্র লাঠি। ব্যস্, অল ক্লিয়ার। চল এবার।

বস্তুত লাঠি ছিল দীনেশের কাছে ন্যায় ও সত্যের প্রতীক। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে জীবনে এমনি করে তাকে লাঠি নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হয়েছে অসংখ্যবার।

হঠাৎ একদিন বুকফাটা কান্নার রোল উঠল পাড়ায়। কি ব্যাপার!

ব্যাপার সত্যিই গুরুতর। কে একজন সুযোগ-সন্ধানী লোক কোন এক অনাথা বিধবাকে ঠকিয়ে আত্মসাৎ করেছে তার যথাসর্বস্ব। আজ সে এসেছে তাকে তার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে।

সঙ্গে সঙ্গে দীনেশ হাজির।

—ওসব মতলব ছাড়ুন ভাই। ওর সম্পত্তি ওকে ফিরিয়ে দিন। নইলে—

—হ্যাঁ, আমিও আছি। সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠিটা মেঝেতে বার-কয়েক ঠুকে দিলেন বন্ধু অনুজা।

তবে শেষ পর্যন্ত আর সে লাঠি হাতে তোলবার প্রয়োজন হল না, মল্লিকা। তার আগেই যথাসর্বস্ব ফিরিয়ে দিয়ে মানে মানে কেটে পড়ল সুপুত্তুরটি।

আরে বাস্‌রে বাস্! যেমন বুকের ছাতি, তেমনি তেল-পাকানো লাঠি। কাজ নেই বাপু সম্পত্তিতে। তার চাইতে জান নিয়ে সরে পড়াই ভাল।

তুই বন্ধু। দীনেশ ও অনুজা।

নিজেকেও বোধহয় দীনেশ ততটা ভালবাসতেন না, যতটা ভালবাসতেন এই বন্ধু অনুজাকে।

অনুজাও ছিলেন ঠিক তেমনিই। যেখানে দীনেশ, সেখানেই তাঁর পাশটিতে গিয়ে তাঁর হাজির থাকা চাই।

কোথায় কোন্ রসুলপুরে আগুন লেগেছে। এখুনি কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার। নইলে গোটা অঞ্চলটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ছাই হয়ে যাবে শত শত প্রাণীর আশা ও বিশ্বাসে গড়া নীড়।

ঝাঁপিয়ে পড়লেন দীনেশ। কিন্তু একি! জলভরা বালতিগুলো কে একটার পর একটা এগিয়ে দিচ্ছেন তাঁর দিকে?

কে আবার! বন্ধু অনুজা ছাড়া কে আর দীনেশের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন এমন করে!

মারাত্মক টি. বি. রোগী। কেউ নেই তার তিনকুলে। কেউ না থাক, দীনেশ তো আছেন।

আর হ্যাঁ, অনুজাও আছেন। থাকতেই হবে। বন্ধু দীনেশকে একা কোথাও ছেড়ে দিতে তিনি রাজি নন।

ইতিমধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দীনেশের দুই ছোটভাই ভবেশ ও প্রকাশও তখন বসিরহাট থেকে সাত নম্বর বাড়িতে এসে গেছেন। বড়ভাই অবিনাশ শুরু করেছেন কণ্ট্রাকটারী। সব মিলিয়ে তিনতলার চিরকুমার সভাটি একেবারে জমজমাট।

আশ্বস্ত হতে পারলেন না বড়ভাই অবিনাশ। মেনি যেন আর সেই মেনি নেই। কিসের যেন একটা চাপা আগুন ক্ষণে ক্ষণেই ঝলসে ওঠে তার চোখের তারায়।

আর ঐ দোতলার মেয়েদের ভাবগতিকও যেন খুব একটা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

এক-একটি মেয়ে যেন এক-একটি আগুনের ফুল্‌কি। চোখে

সেই জ্বালাভরা দৃষ্টি। মনে হয়, ভেতরে ভেতরে ওরা যেন জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক মেনির মত।

অবিনাশবাবুর আশঙ্কা অমূলক ছিল না, মল্লিকা। দীনেশ তিনতলার বাসিন্দা।

আর দোতলায়! দোতলায় কারা ছিলেন সেদিন!

যথাসময়ে তাঁদের কথা তোমাকে বলব, মল্লিকা। তবে মনে রেখো যে, স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে তিনতলার মত এই দোতলার অবদানও কিছুটা কম ছিল না।

বোধহয় এ-সব কারণেই পরবর্তী কালে রামমোহন রায় রোডের এই তিনতলা বাড়িটাকে সবাই 'বোমার বাড়ি' বলে আখ্যা দিয়েছিল।

'যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।'

বাংলার সেই হারানো দিনের এক আশ্চর্য নারী কমলা দাশগুপ্তাও সেদিন সঙ্গীতের মত এই আহ্বান শুনেছিলেন, মল্লিকা। দীনেশের প্রতিটি বৈপ্লবিক কর্মধারার সঙ্গে তিনি ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এ অধ্যায়ে দীনেশের মত আমিও তাঁকে কমলাদি বলে উল্লেখ করব, মল্লিকা।

শুধু তাঁকেই নয়, অন্যান্য যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদেরও আমি উল্লেখ করব এই একইভাবে। দীনেশ তাই করতেন।

আজ দিন পাল্টেছে। বদলেছে কর্মব্যস্ত জীবনের ধারা ও রূপ।

কিন্তু সেদিন! আজকের মত সেদিন কিন্তু সমাজে এতটা ভাঙন ধরেনি। অন্তত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা সেদিন ছিলেন সুখী ও আস্থাবতী।

সুতরাং প্রচলিত বিধি-নিষেধের বাইরে পা বাড়ানো সেদিন খুব একটা সহজ ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না।

তবু কমলাদি সাড়া দিয়েছিলেন। উপায় নেই। এ যে নিশির ডাক। এ ডাক যে একবার শুনেছে, সাড়া যে তাকে দিতেই হবে।

অথচ দু-বছর আগে বেথুনে বি. এ. পড়াকালীন সময়েও তিনি ছিলেন এক আলাদা জগতের মেয়ে।

শুধু একনম্বর অখিল মিস্ত্রী লেনের বাড়ি আর কলেজ। শুধু বই আর বই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষাগুলোতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে হবে। বাবার একান্ত বাসনাকে পূর্ণ করতে হবে। বড় মেয়ে কমলা সম্বন্ধে যে তাঁর অনেক আশা। অনেক স্বপ্ন।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর। হঠাৎ কমলাদির ছক-বাঁধা জীবনে এল এক আকস্মিকতার চমক।

অলক্ষ্য থেকে কার যেন ডাক শুনলেন তিনি। শুনলেন নিজের মন থেকেই।

অন্তরের সেই নবচেতনায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক চিঠি লিখে বসলেন গান্ধীজীকে—'তোমার পাশে থেকে আমি কাজ করতে চাই বাপুজী। আমাকে তুমি ডেকে নাও।'

আশ্চর্য, ক-দিন বাদেই জবাব এসে হাজির। লিখেছেন—মন যদি চায় তো চলে এসো। তবে অভিভাবকের অনুমতি থাকা চাই।

অভিভাবকের অনুমতি! হাস্যোজ্জ্বল মুখে একটা কালো ছায়া নামল কমলাদির।

অসম্ভব! স্নেহপ্রবণ বাবা যে তাঁর একান্ত প্রিয় কন্যাকে মুহূর্তও চোখের আড়াল করতে রাজি নন।

চলে গেলে তাঁর কি করে চলবে? তাঁর দিকটাও ভাবতে হবে তো!

অথচ কানের কাছে অহরহ বেজে চলেছে সেই একই ডাক। একই আকুলতা। নিজেকে যে ধরে রাখাও দায়।

অন্তরের এই জাগ্রত চেতনায় সেদিন এই ডাকটুকু শুধু কমলাদিই শোনেননি, মল্লিকা। তখনকার দিনের বিদুষী তরুণী কল্যাণী দাস, সুলতা কর, আভা দে, সুহাসিনী দত্ত, শান্তিসুধা ঘোষ, প্রভাতনলিনী দেবী, সুরমা মিত্র, লালা কাম্‌লে প্রমুখ কেউ বোধহয় এ-ডাক শুনে সেদিন স্থির থাকতে পারেননি।

কোথায় যেন একটা প্রহর বাজবার সঙ্কেত শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে চল! এগিয়ে চল!

মল্লিকা, এই এগিয়ে চলার ফলশ্রুতি হিসেবেই সেদিন গঠিত হয়েছিল 'ছাত্রীসঙ্ঘ', এই অধ্যায়ে যে ছাত্রীসঙ্ঘের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। আর দীনেশই ছিলেন সেদিন তাদের লাঠিখেলার শিক্ষাগুরু।

কেটে গেল আরো কিছুদিন।

সেদিন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর কাহিনী পড়তে পড়তে একসময়ে তন্ময় হয়ে ডুবে গেলেন কমলাদি।

ক্যাপ্টেন হিউরোজের নেতৃত্বে সুশিক্ষিত ইংরেজ-বাহিনী দুর্গ অবরোধ করেছে। ঝান্সী তাদের চাই-ই।

প্রত্যুত্তরে শোনা গেল বীরাঙ্গনা নারীর সেই ঐতিহাসিক উক্তি, 'মেরা ঝান্সী নেহী দুঙ্গি।'

তারই প্রতিধ্বনি তুলল তাঁর একান্ত অনুগত সুদক্ষ গোলন্দাজ ঘৌস মহম্মদ 'করক বিজলীর' মুখ দিয়ে গোলাবর্ষণ করে।

অত্যন্ত বিখ্যাত কামান ঝান্সীর এই কর্‌ক বিজলী। একমাত্র ঘৌস মহম্মদ ছাড়া আর কারো পক্ষেই এ কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা সম্ভব নয়।

অনেক চেষ্টার পরে অবশেষে একসময়ে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন ক্যাপ্টেন হিউরোজ। গড্ সেভ দি কিং। ঘৌস মহম্মদ খতম। এবার আর ঠেকায় কে?

কিন্তু একি! আবার গোলা উদ্গিরণ করে চলেছে কর্‌ক বিজলী!

সেই একই ভাবে। একই নির্ভুল নিশানায়। কি করে এটা সম্ভব। ঘৌস মহম্মদ ছাড়া তো এ কামান চালু করা সোজা কথা নয়!

তাহলে কে এই শক্তিধর পুরুষ, যিনি কর্‌ক বিজলীর মুখ দিয়ে এভাবে নির্ভুল নিশানায় গোলাবর্ষণ করে চলেছেন?

দূরবীণ চোখে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময়ের ধাক্কায় ছিট্‌কে পড়লেন ক্যাপ্টেন হিউরোজ।

অবিশ্বাস্য! অকল্পনীয়! অভাবনীয়! পুরুষ নন, গোলাবর্ষণ করে চলেছেন এক নারী।

মতিবাঈ। শহরের শ্রেষ্ঠা নটী মতিবাঈ। কাল যিনি ছিলেন পুরুষের কামনার সামগ্রী, আজ তিনি স্বাধীনতার পূজারিণী।

আরো আশ্চর্য, গোলাবর্ষণের ব্যাপারে যাঁরা মতিবাঈকে সহযোগিতা করে চলেছেন, তাঁরাও নারী। প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে চলেছেন—নারী!

দুর্গপ্রাচীরের একদিকে ফাটল ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে চলছে তার মেরামতের কাজ। আশ্চর্য, সেখানেও নারী! দেখতে দেখতে তাঁরাই আবার সুদৃঢ় করে তুলছেন দুর্গপ্রাচীরকে।

হঠাৎ ইংরেজপক্ষের একটা গোলা লেগে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মতিবাঈ-এর দেহ। কিন্তু কই, কর্‌ক বিজলী তো নীরব হল না।

এবার এসেছেন রাণীর একান্ত সহচরী মান্দার। তিনিও গেলেন একসময়ে।

তারপর একে একে এলেন সুন্দর, কাশী ও ঝলকারী। তাঁরাই শেষপর্যন্ত চালু রাখলেন কর্ক বিজলীকে।

পড়তে পড়তে কোথায় তলিয়ে গেলেন কমলাদি। ডুবে গেলেন নীরব মধুর এক নিঃসঙ্গতার গভীরে।

এরই নাম স্বাধীনতা। এমনি মূল্য দিয়েই বুঝি তাকে পেতে হয়। এমনি চরম আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়েই বুঝি তাকে রক্ষা করতে হয়।

কিন্তু যে নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে সেদিনের মেয়েরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, আজ তা সম্ভব হবে না কেন?

নিশ্চয় সম্ভব। জীবনে ব্যক্তিগত সাফল্যই সব নয়। তা ছাড়াও আরো কিছু আছে।

এমন অনেক কিছু আছে যা না পেলে জীবনের অন্য সব পাওয়াই ব্যর্থ হয়ে যায়। এবার তাকে পেতে হবে। জানতে হবে। পথের সন্ধান খুঁজে পেতে হবে।

ঠিক তখনই ছন্দভরা মনের তারে বেজে উঠল কার ত্রস্ত ঝঙ্কার।

সন্ধান দিলেন সেই সাত নম্বর বাড়ির দোতলার মেয়ে সহপাঠিনী কল্যাণী দাস।

দুজনেই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের ছাত্রী। একই শিক্ষায় শিক্ষিতা। একই পরিবেশে তাঁদের প্রাত্যহিক জীবন।

কথায় কথায় কল্যাণীদিই একদিন বললেন, আমাদের ছাত্রীসঙ্ঘের মাস্টারমশাইয়ের চোখ দুটোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো ভাল করে। দেখবে, অনেক কথাই ওখানে লেখা রয়েছে।

কমলাদি অবাক। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, ছাত্রীসঙ্ঘের

শিক্ষাগুরু দীনেশবাবু তাঁর অপরিচিত নন। অনেকদিন অনেকভাবেই তিনি তাঁকে দেখেছেন।

ওঁর ঐ বলিষ্ঠ দেহটার আড়ালে যে অন্য একটা মানুষ লুকিয়ে আছে, সে খবর সত্যিই জানা ছিল না তাঁর।

দীনেশের হাতের লাঠি গান ধরেছে। সুর তুলেছে। ছন্দে ছন্দে নেচে চলেছে।

সাত নম্বর বাড়ির ছাদে লাঠি খেলার আসর বসেছে ছাত্রীসঙ্ঘের মেয়েদের। নির্দিষ্ট তারিখে এখানেই তাঁরা এসে থাকেন দল বেঁধে।

কমলাদিও এসেছেন। দু-চোখে তাঁর অনন্ত বিস্ময়।

আশ্চর্য, ঘূর্ণায়মান লাঠির গতি ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে। আর দেখাই যায় না। শুধু মনে হয়, একটা দামাল শিশু যেন নিজের মনেই নাচছে, দুলছে, খেলা করছে।

ঠিকই বলেছিল সহপাঠিনী কল্যাণী। অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদে ভরপুর এ যেন এক আশ্চর্য পুরুষ।

দেহে যৌবনের দুর্বার গতিছন্দ। চোখে দিগন্তসীমার মত উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। পেশীবহুল স্বাস্থ্য আর প্রাণপ্রাচুর্যে যেন উপচে পড়ছে ওঁর জীবনপাত্র।

আর কি অদ্ভুত ধৈর্য! একসঙ্গে এতগুলো মেয়েকে তালিম দেওয়া সোজা পরিশ্রমের কাজ নয়। অথচ এ ব্যাপারে ওঁর এতটুকুও শ্রান্তি বা ক্লান্তি নেই।

আছে শুধু স্নিগ্ধ আন্তরিকতা, গভীর উৎকণ্ঠা ও সহানুভূতি। শিক্ষাগুরু হিসেবে সহপাঠী দীনেশবাবু সত্যিই বস্তু।

দিন কাটতে লাগল, কিন্তু কোথায় কি!

ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলেন কমলাদি। যাঁর মুখের একটিমাত্র কথার প্রতীক্ষায় তিনি প্রহর গুনে চলেছেন, তিনি যেমন নির্বিকার পুরুষ, তেমনি প্রচার-বিমুখ। দুর্ভেদ্য দুর্গের লৌহদ্বার অর্গলবদ্ধ। ভেতরে প্রবেশের কোন পথ নেই।

অথচ সহপাঠিনী কল্যাণীর কথাটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। দীনেশবাবুকে চিনতে সময় লাগে না। ওঁর বড় বড় দুটি সরল চোখের মধ্যে অনেক কথাই লেখা রয়েছে।

অপেক্ষা করে করে এবার মরীয়া হয়ে উঠলেন কমলাদি।

না, আর দেরি নয়। আবেদন-নিবেদনও নয়। এবার দাবি জানাতে হবে। বন্ধুত্বের দাবি। ছাত্রীর দাবি।

মনস্থির করে পরদিন সন্ধ্যায় একাই গিয়ে সাত নম্বর বাড়িতে হাজির হলেন কমলাদি। দাবিও পেশ করলেন যথারীতি।

বন্ধুর পথে আমি বন্ধু হতে চাই। কথা দিতে হবে। রিক্ত হাতে আমি ফিরে যেতে রাজি নই।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন দীনেশ। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, এ-কথার অর্থ কি জানেন কমলাদি?

—জানি। স্পষ্ট দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করলেন কমলাদি, পরাধীন জাতির দেশ-প্রেমের একমাত্র শাস্তি, মৃত্যু। তার জন্য আমি প্রস্তুত। প্রমাণ চান? বেশ, যথাসময়েই তার প্রমাণ দেব। এবার কথা দিন আমাকে!

স্থিরদৃষ্টিতে কমলাদির মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভেতরটা বুঝে নিতে চেষ্টা করলেন দীনেশ। তারপর ম্লান হেসে বললেন, আজ কমলাদি। রাতটা ভাল করে ভেবে দেখুন। বার বার প্রশ্ন মাস্টারজেকে, তারপর মনস্থির করে কাল দুপুরের দিকে একবার করে।

কম করে আর মনস্থির করার কিছুই ছিল না, তাই পরদিনই আবার গিয়ে হাজির হলেন সাত নম্বর বাড়িতে।

কিন্তু কোথায় সেই দীনেশ? প্রবল জ্বরে তিনি তখন প্রায় অচৈতন্য।

আশ্চর্য, কমলাদিকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসলেন দীনেশ। নিন, চলুন!

—সেকি! কমলাদি অপ্রস্তুত। এ অবস্থায় যাবেন কি করে?

—খুব পারব। রোগপাণ্ডুর মুখে একঝলক প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল দীনেশের, সবার আগে কাজ। তাতে ব্যক্তিগত সুবিধে-অসুবিধের কোন প্রশ্নই ওঠে না। নিন, চলুন!

—কোথায়? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন কমলাদি।

—আমার এক দাদার কাছে। তিনিই আপনার এই প্রশ্নের জবাব দেবেন। চলুন!

কিছুক্ষণের মধ্যেই দীনেশের পেছন পেছন গিয়ে একটা হাওড়া-গামী বাসে চেপে বসলেন কমলাদি। মনে অসংখ্য কথার ভিড়। অসংখ্য প্রশ্ন।

কে এই দীনেশবাবুর দাদা?

কি তাঁর পরিচয়? কোথায় যেতে হবে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য?

হঠাৎ কি দেখে সন্দেহের একটা কালো ছায়া দুলে উঠল কমলাদির চোখের তারায়।

বাসের মধ্যেই দাঁড়ানো কে যেন একটা লোক দূর থেকে তাঁদের লক্ষ্য করছে।

কৌতুক, বিস্ময় ও আরো অনেক কিছুর সংমিশ্রণে এক অস্বাভাবিক দ্যুতিতে প্রখর হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টি।

ঘৃণায় মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন কমলাদি।

নিশ্চয় কোন পুলিসের লোক। দীনেশবাবুর সত্যিকার পরিচয় আজ আর তাদের অজানা নেই। দূর থেকে তাই হয়তো তারা তাঁর পিছু নিয়েছে।

হাওড়া থেকে আবার বাস। এবারের লক্ষ্য বোটানিক্যাল গার্ডেন।

আশ্চর্য, এখানেও সেই লোকটা! চোখে সেই পুলিসী দৃষ্টি। জ্বালাতন আর কি!

যথাস্থানে গিয়ে কমলাদি অবাক।

আশ্চর্য, সেই লোকটা! আগে থেকেই দিব্বি সে এখানে এসে হাজির। চোখে-মুখে নির্বিকার ভাব। দেখে কে বলবে যে, এ-লোকটা আসলে একটা পুলিসের গুপ্তচর ছাড়া আর কিছুই নয়!

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। সেই গুপ্তচরটাই সর্বপ্রথম কথা বললেন, আসুন ভাই! আপনার জন্যই আমি বসে আছি। তুমিও বসো দীনেশ।

কমলাদি অপ্রস্তুত। ইনিই দীনেশবাবুর সেই দাদা! আর ভুল বুঝে তিনি কিনা সারাটা পথ তাঁকে ভেবে এসেছেন পুলিসের গুপ্তচর বলে! কি লজ্জা! কি লজ্জা!

—ঘাসের ওপর আরাম করে বসুন ভাই। সহাস্যে বললেন বিপ্লবী নেতা রসিক দাস, দীনেশের মুখে সব কথাই শুনেছি। হ্যাঁ, আমিই আপনার জিজ্ঞাসার জবাব দেব। কিন্তু কি বলব? বলার আছেই বা কি? স্বাধীন দেশে দেশপ্রেমিক বীর বলে সম্মান পায়। আর আমরা! আমরা পরাধীন। পরাধীন বলেই দেশপ্রেমের অপরাধে আমাদের জন্য পদে পদে অপেক্ষা করে আছে ফাঁসি, দ্বীপান্তর বা কারাবাস। তা জেনেও আমরা এগিয়ে চলেছি। হয় কূল, নয়তো অতল সমাধি, এ-ছাড়া আমাদের অন্য কোন পথ নেই।

প্রতিটি কথা ঢেউ তুলছিল কমলাদির মনে। কি সহজ সরল অভিব্যক্তি! কি স্পষ্ট স্বীকৃতি! এই স্বীকৃতির মধ্যে কোথাও এতটুকু অস্পষ্টতা নেই। কথার আতসবাজি নেই।

—ওরা অস্ত্রবলে বলীয়ান, আর আমরা! একইভাবে বলতে

লাগলেন রসিকদা, কি আছে আমাদের! আছে শুধু নিষ্ঠা আর একাগ্রতা। এইটুকুই আমাদের মূলধন। এই মূলধন নিয়েই আমরা একের পর এক এগিয়ে যাব। হয়তো আমি হারিয়ে যাব। দীনেশও যাবে। তারপর একের পর এক সবাই যাবে। তবু আমাদের এই নিঃশেষ আত্মবিসর্জন ব্যর্থ হবে না। আঘাতের পর আঘাতে ঐ কঠিন পাথরের বুকে একদিন-না-একদিন ফাটল ধরবেই। এই বিশ্বাসটুকুই আমাদের একমাত্র সম্বল।

—আমিও এ-দেশের মেয়ে। হঠাৎ বললেন কমলাদি, পরাধীনতার জ্বালা আমারও কিছু কম নয়। আমি কি পারি না এ-কাজে আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াতে?

অবাক বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন বিপ্লবী নেতা রসিক দাস।

দেখতে দেখতে তাঁর সারামুখে ফুটে উঠল একঝলক নিশ্চিন্ত নির্ভরতার হাসি।

এ মেয়ে সাধারণ মেয়ে নয়। একই সঙ্গে তার সারামুখে ফুটে উঠেছে অনির্বচনীয় কমনীয়তা ও অসঙ্কোচ দৃঢ়তা। হ্যাঁ, ও পারবে। নিশ্চয় পারবে।

—আমাকে কি করতে হবে নির্দেশ দিন? প্রশ্ন করলেন কমলাদি।

—নির্দেশ! হাসলেন রসিকদা, নির্দেশ যখন যা দেবার দীনেশই দেবে। ওর কাছ থেকেই সব জানতে পারবেন। যাক, আজকের মত এখানেই শেষ। এবার ওঠা যাক!

এবার ফেরার পালা।

অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে কমলাদির মন তখন আচ্ছন্ন। আর কোন দ্বিধা নয়। কোন কুণ্ঠা নয়। এবার শুধু এগিয়ে যাবার পালা।

হয়তো আঘাত আসবে। ঝড় উঠবে। উঠুক। সমস্ত বাধা-

বিপত্তি সে পর্যুদস্ত করে এগিয়ে যাবে আপন লক্ষ্যের দিকে। কেউ পারবে না তার গতিরোধ করতে। কেউ না।

—কই, আপনি কিছু বলছেন না যে? দীনেশকে নিঃশব্দ দেখে সহসা প্রশ্ন করলেন কমলাদি, কিছু নির্দেশ দিন!

—দেব। হাসলেন দীনেশ, শুধু একটা নির্দেশই আজ আপনাকে দেব, তা হল 'মন্ত্রগুপ্তি'। এটাই আমাদের মূলনীতি। অর্থাৎ—কে-কি-কেন—এ নিয়ে কোন প্রশ্ন নয়। কোন কথা নয়। এমন কি বিশ্বস্ত কোন লোক হলেও নয়। সৈনিকের একমাত্র কাজ, নিঃশব্দে প্রতিটি আদেশ পালন করা। আপনাকেও তাই করতে হবে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। এ ব্যাপারে আমরা সবাই এক ও অভিন্ন।

মনে মনে কথাগুলোকে বার বার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন কমলাদি।

কোন কথা নয়। কোন প্রশ্ন নয়। শুধু সৈনিকের মত প্রতিটি আদেশ নিঃশব্দে পালন করতে হবে। তাই হোক। তাই হোক।

এ শুধু কথার কথা নয়, মল্লিকা। তখনকার দিনে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রতিটি মানুষকে এই নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হত। কমলাদিও তার ব্যতিক্রম নন। এমন কি চরম সঙ্কটের মুহূর্তেও তিনি তা কোনদিনই ভুলে যাননি। যথাসময়ে সেকথা তোমাকে বলব।

কাজ কাজ আর কাজ! নিরবচ্ছিন্ন কাজ। নতুন জীবনে নতুন পরিবেশে দেখতে দেখতে কাজের নেশায় মশগুল হয়ে গেলেন কমলাদি। কাজ ছাড়া আর সব কিছুই চাপা পড়ে গেল মনের অতল গভীরে।

ইতিমধ্যে দীনেশের সঙ্গে বহুবারই তাঁর দেখা হয়েছে। দুজনে একই শিক্ষায় শিক্ষিত। একই পথের পথিক। সুতরাং সখ্যতার বন্ধন আরো দৃঢ় হয়েছে প্রাত্যহিক দেখাশোনা আর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। ব্যবধান ঘুচেছে দূরত্বের।

এমন এক দিনের কথা। সেদিন সাঁতার শেখার জন্য ছাত্রীসঙ্ঘের মেয়েরা সবাই জড় হয়েছেন শ্রীশ নন্দীর পাঁচিল-ঘেরা বাগান-বাড়ির পুকুরঘাটে।

হঠাৎ কি দেখে দৃষ্টিটা থমকে গেল কমলাদির।

হাসি-খুশিতে উচ্ছল কে এই অদ্ভুত প্রাণবন্ত মেয়েটি? ঠিক যেন কোন খরস্রোতা পার্বত্য তটিনী। বাধা-বন্ধনহীন খুশির জোয়ারে ও যেন সর্বক্ষণ আপন ছন্দে হেসে চলেছে খিল খিল করে।

জানা গেল মেয়েটির নাম পুঁটু। ভাল নাম সুহাসিনী গাঙ্গুলী। তবে পুঁটু নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিতা। কলকাতা মূক-বধির স্কুলের শিক্ষিকা। থাকেন ওখানকারই হোস্টেলে।

অদ্ভুত মেয়ে। মনে মনে বললেন কমলাদি। বেশ বোঝা যায় যে, এ মেয়ে ভাঙবে তবু মচকাবে না। ওর চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টিতেই যেন ওর ভেতরের চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যায়। দলে আজ এমনি মেয়ের তো সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

যোগাযোগ হতে দেরি হল না। যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক তাই। সত্যিই অসামান্যা মেয়ে। তারপর একদিন দীনেশ ও রসিকদার দরবারে। সেখানেও পুঁটুদি উত্তীর্ণ হলেন বেশ সসম্মানেই।

কমলাদি, দীনেশ ও রসিকদার বিচারে এতটুকুও ভুল হয়নি, মল্লিকা। পরবর্তীকালে দলের প্রয়োজনে এই পুঁটুদি যা করেছিলেন, তা বুঝি একমাত্র তাঁর মত দুঃসাহসী মেয়ের পক্ষেই সম্ভব। সেকথা বলব তোমাকে যথাসময়ে।

শীতের পড়ন্ত রোদ ফিকে হয়ে এসেছে। একটা শিরশিরে হাওয়া উঠেছে আস্তে আস্তে।

ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন লেডিজ পার্কে গোল হয়ে বসে তিনজন। কমলাদি, পুঁটুদি ও অন্য একজন মহিলা—যিনি আজ আর তাঁর নাম প্রকাশে ইচ্ছুক নন।

রোজই তাঁরা এসে বসেন এ-সময়ে। তারপর ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করতে করতে কখন যে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত ঘন হয়ে আসে, সেদিকে কারোরই খেয়াল থাকে না।

ওদিকে মেয়ের ভাবগতিক লক্ষ্য করে মহাভাবনায় পড়ে গেলেন কমলাদির বাবা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

অবশ্য তিনি অবুঝ নন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর একান্ত-সচিব হিসেবে এককালে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় তাঁর জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলো কম আগুন ছড়ায়নি সারা দেশে।

তবু সন্তানস্নেহের কাছে তিনি শিশুর মতই অসহায়। বিশেষ করে বড় মেয়ে কমলার ব্যাপারে তো কথাই নেই। একদণ্ড চোখের আড়াল হলেই তিনি অস্থির।

মেয়েও ঠিক তেমনিই। বাবা বলতে সে অজ্ঞান। বাবা শুধু তার বাবাই নন, বন্ধুও বটে।

অথচ সেই মেয়ে আজকাল আড়ালে আড়ালে থাকতেই যেন বেশি ভালবাসে। কখন আসে, কখন যায়, কোন কিছুরই ঠিক-ঠিকানা নেই।

বেশ বোঝা যায়, কোথায় যেন তার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। যে মধুর সম্পর্কটুকু তাদের দুজনকে ঘিরে একটি শান্তিময় জগৎ গড়ে তুলেছিল, আজ তা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

কেন এমন হল ? কেন ?

ভেবে ভেবে যেন আর কূল-কিনারা পান না সুরেন্দ্রবাবু। কই, আগে তো কোনদিনও সে এমন ছিল না ? খাতাপত্র আর বই ছাড়া কোন কিছুর সঙ্গেই তার কোন সম্পর্ক ছিল না। তার বাইরেও যে একটা বৃহত্তর জগৎ আছে, সে-খবরও ছিল তার কাছে অজ্ঞাত।

কিন্তু আজ! আজ জীবনের নামে কোথায় ছুটে চলেছে সে ? কোন্ সর্বনেশে পথে ?

অবশ্য মেয়েকে তিনি ভাল করেই জানেন।

কঠিন বস্তুবাদী মেয়ে। ভাব-বিলাসের কোনদিনই ধার ধারে না। প্রলোভনের পাশ কাটিয়ে, আবর্জনার বেড়া ডিঙিয়ে চলার মত শিক্ষা তার যথেষ্টই আছে।

তবু সময়টা ভাল নয়। ১৯৩০ সাল। আকাশে-বাতাসে সর্বত্র কিসের যেন একটা চাপা অস্থিরতা। কি যেন একটা বড় রকম ঝড় উঠবে। উদ্দাম ঝড়। সুতরাং ভাবনা একটু হয় বৈকি !

সেদিন কমলাদি বাড়ি ফিরে আসতেই দূর থেকে আহ্বান জানালেন সুরেন্দ্রবাবু, একবার আমার কাছে আয় দেখি মা !

আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন কমলাদি। অস্বাভাবিক কাঁপুনী শুরু হয়েছে বুকের ভেতরে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। কি বলবেন বাবা ! কি বলবেন !

—তোর কি হয়েছে বল্ তো মা ? জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন সুরেন্দ্রবাবু।

—কিছু হয়নি তো বাবা ! জোর করে মুখে হাসির রঙ ফুটিয়ে তুললেন কমলাদি।

—হয়নি ! নিজের মধ্যেই বুঝি একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করলেন সুরেন্দ্রবাবু, তাহলে রাতদিন কি ভাবিস এত ? কোথায় থাকিস এত রাত অবধি ? কই, আগে তো কোনদিনও দেখিনি ?

এত বড় সংযমের পরীক্ষা বুঝি জীবনে আর কোনদিনও দেননি কমলাদি।

উত্তরের আশায় বাবা তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। কিন্তু কি উত্তর দেবেন তিনি? মিথ্যে বলতে তাঁর রুচিতে বাধে। কিন্তু উপায় কি!

রোগীর মৃত্যু আসন্ন জেনেও কি চিকিৎসককে মিথ্যে বলতে হয় না? সে মিথ্যের মর্যাদা যে সংসারে সত্যের চাইতেও বেশি!

—বিশ্বাস কর বাবা, আমি কোন অন্যায় করিনি। কৌশলে উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন কমলাদি, করবও না কোনদিন। এমন কাজ কোনদিনই করব না, যার ফলে তোমাকে মাথা নত করতে হয়।

—জানি মা, জানি! নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সুর ফুটে উঠল সুরেন্দ্র-বাবুর কণ্ঠে, তোকে আমার চাইতে বেশি আর কে জানে? তবু দিন-কাল ভাল নয়। একটু সাবধানে থাকিস।

তখনকার মত ব্যাপারটা মিটে গেলেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু এতটুকুও আশ্বস্ত হতে পারলেন না সুরেন্দ্রবাবু।

কমলা যেন আর সেই কমলা নেই। কিসের যেন একটা অমঙ্গল ক্রমশই কালো ডানা মেলে এগিয়ে আসছে তার জীবনের ওপর। তার অশুভ সঙ্কেতটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চোখের সামনে।

সুতরাং অচিরেই একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। সব চাইতে ভাল হয় এ-সময়ে বিয়েটা দিতে পারলে।

স্ত্রী চারুলতা দেবীও স্বামীর মতেই মত দিলেন।

হ্যাঁ, সেই ভাল। শিক্ষিতা মেয়ে। দেখতে-শুনতেও ভাল। পাত্রের জন্য ভাবনা কি!

বেঁকে বসলেন কমলাদি। না, তা হয় না। একদিন বিয়ের নামে যে শির শির-করা রোমাঞ্চ ছিল, আজ আর সে স্বপ্ন তাঁর মনে এতটুকু রামধনুর রঙ ছড়ায় না।

তার চাইতে বড় স্বপ্ন আজ, স্বাধীনতা। দেশের মুক্তি। সে

স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়ে অসংখ্যের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়।

দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে উঠল সুরেন্দ্রবাবুর মুখ।

কি ব্যাপার! বয়স্থা মেয়ে। জীবনের একটা ভবিষ্যৎ পথ-নির্ণয় করার দিন কি ওর এখনো আসেনি? তাহলে কেন ওর এই দ্বিধা? কোথায় এই রহস্যের উৎস?

ভাবতে ভাবতে অবশেষে একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে দাঁড়ালেন সুরেন্দ্রবাবু।

কয়েক মাসের জন্য বাইরে গেলে কেমন হয়! হয়তো দূরে কোথাও গেলে ওর মনের এই গুমোট ভাবটা কেটে যেতে পারে। হয়তো আবার ও আগের মত সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। দেখাই যাক না!

এবার আর আপত্তি করলেন না কমলাদি। করলেন না স্বাভাবিক কারণেই। ওদিক থেকে অনুমতি মিলেছে। তবে যোগা-যোগ রাখতে হবে নিয়মতভাবেই। কখন কি দরকার হয় কিছু বলা যায় না।

যথাসময়ে সবাইকে নিয়ে দার্জিলিং গিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন সুরেন্দ্রবাবু। আর ভাবনা নেই। এবার নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না কমলাদি। ভাল লাগে না। ক্ষণে ক্ষণে মন উধাও হয়ে যায় কোন্ রঙীন মেঘ-ছোঁয়া দিগন্তের ওপারে। যে করে হোক কলকাতার সঙ্গে একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বেই করতে হবে।

শেষপর্যন্ত কার সাহায্যে যোগাযোগ হল জান, মল্লিকা? যোগাযোগ হল অভেদানন্দ আশ্রমের এক স্বামীজীর সাহায্যে।

বস্তুত স্বাধীনতা-আন্দোলনে কার যে কতখানি দান, তার সঠিক হিসেব দেওয়া ইতিহাসের পক্ষেও বুঝি সম্ভব নয়। নইলে আচার্য জগদীশ বসু, আচার্য পি. সি. রায়, বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা প্রমুখ

প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরাও যে সেদিন নানাভাবে সহায়তা করে এই আন্দোলনকে পুষ্ট করে তুলেছিলেন, তা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল কোনদিন ?

অথচ দিবালোকের মতই তা সত্য। তেমনি সত্য দার্জিলিঙের অভেদানন্দ আশ্রমের এই স্বামীজী। এ ব্যাপারে তাঁর সহায়তাও তুচ্ছ নয়।

ব্যাপারটা হয়েছিল এইরূপ : দার্জিলিঙে যে হোটেলে কমলাদিরা থাকতেন, তার খানিকটা নিচেই ছিল অভেদানন্দ আশ্রম।

মাঝে মাঝেই সেখানে বেড়াতে যেতেন কমলাদি। বেশ নিরিবিলি জায়গা। পরিবেশের দিক থেকেও শান্ত ও সমাহিত।

হঠাৎ একদিন স্বামীজীর চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টিটা থমকে গেল কমলাদির। সেই দৃষ্টি। চোখের তারায় সেই ছাই-চাপা আগুন। সারামুখে সেই দৃঢ় সঙ্কল্পের রেখা।

হাসলেন স্বামীজী। হাসলেন দুজনেই। উভয়েই চিনলেন উভয়কে। বলা বাহুল্য যে, এর পরে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে আর অসুবিধেই রইল না।

এমনি একদিনের কথা। সেদিন ছিল এপ্রিল মাসের উনিশ তারিখ। সকালে আশ্রমে পা দিয়েই কমলাদি অবাক। কিসের যেন একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দে স্বামীজী সেদিন আত্মহারা। কি ব্যাপার !

—এই যে ! কমলাদিকে দেখেই আনন্দে প্রায় লাফাতে লাগলেন স্বামীজী, জয় মা কালী ! জয় বাবা ভোলানাথ ! এসে গেছে। এসে গেছে। গীতায় পড়নি যে—'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম্, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' সে এসে গেছে। চট্টগ্রামে সে এসে গেছে। চট্টগ্রাম জেগেছে। ধন্য মা চট্টলেশ্বরী ! ধন্য তোমার সুসন্তান সূর্য সেন! ধন্য তাঁর প্রতিটি সুশিক্ষিত মুক্তিকামী সৈনিক ! ধন্য ! ধন্য !

খবর শুনে একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে দেহের প্রতিটি রক্তকণা ঝিম ঝিম করে উঠল কমলাদির। মনে মনে স্বামীজীর কথাগুলোই তিনি পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন বার বার।

ধন্য! সত্যই ধন্য! গত রাত্রে পরাধীন জাতির ইতিহাসে চট্টগ্রাম যে ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে, তার তুলনা নেই। ওঁদের নমস্কার!

—শুনতে পাচ্ছ মা, শুনতে পাচ্ছ? অদ্ভুত একটা দীপ্তিতে চোখের মণি দুটো ঝিকমিক করে উঠল স্বামীজীর, সিগন্যাল ডাউন। ঘণ্টা বেজেছে। এবার একে একে সবাইকে যেতে হবে। আর দেরি নয়।

এপ্রিল গেল। মে-ও শেষ হল। এল জুন। হঠাৎ আবার একদিন দেখা গেল স্বামীজীর অন্য রূপ। কমলাদিকে দেখেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন সোল্লাসে।

—ডাক এসেছে। ডাক এসেছে। সিগন্যাল ডাউন। ঘণ্টা বেজেছে। শুনতে পাচ্ছ না? এই দেখ তার ফরমান।

কথাটা বলেই স্বামীজী একখানা চিঠি তুলে দিলেন কমলাদির হাতে।

চিঠি পড়ে সমস্যায় পড়ে গেলেন কমলাদি। জরুরী আহ্বান। এক্ষুণি কলকাতা যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? কি যুক্তি তিনি দেখাবেন বাবাকে? অথচ না গেলেই যে নয়!

—হ্যাঁ, যেতে হবে বৈকি! কমলাদিকে চিন্তিত দেখে অভয় দিয়ে বললেন স্বামীজী, ডাক এসেছে যে! রক্তমাখা পায়ের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ? এগুলো কাদের পায়ের চিহ্ন, জান? ট্যাগরা, রজত, স্বদেশ, নরেন—ওদের এই চিহ্ন ধরেই এগিয়ে যাবে, ভাবনার কিছু

নেই। বাবাকে যা বলবার আমিই বলব। যাও! যাও! ছুট্! ছুট্! আর দেরি নয়।

শেষপর্যন্ত তাই করলেন কমলাদি। বাবার উদ্দেশে লেখা একখানি চিঠি স্বামীজীর কাছে গচ্ছিত রেখে পরদিনই তিনি গাড়িতে চেপে বসলেন সবার অগোচরে!

বাপ-মায়ের স্নেহের আড়ালে হেসে-খেলে যে মেয়ে শৈশব-কৈশোর কাটিয়ে এসে যৌবনের দুয়ারে পা দিয়েছেন, তাঁর এই নিঃসঙ্গ যাত্রা কোথায় গিয়ে শেষ হবে কে জানে!

শুধু ভাগ্যদেবতাই বলতে পারে, ভবিষ্যতে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করে আছে! আশীর্বাদ, না অভিসম্পাত?

তবে এত করেও কিন্তু এড়াতে পারলেন না কমলাদি। শিয়ালদা স্টেশনে পা দিয়েই তিনি অবাক।

গেটের বাইরে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর এক জ্যাঠতুত দাদা। দার্জিলিং থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি এসেছেন অবাধ্য বোনকে গ্রেপ্তার করতে।

হাসিমুখেই আত্মসমর্পণ করলেন কমলাদি। দাদার সঙ্গে অখিল মিস্ত্রী লেনের বাসায়ও পৌঁছে গেলেন একান্ত বাধ্য মেয়ের মতই। তারপর যেই একটু ফাঁক পেয়েছেন, অমনি ছুট্।

সর্বাগ্রে দীনেশবাবু ও রসিকদার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে! নইলে হঠাৎ এই জরুরী তলব কেন?

সত্যিই গুরুতর ব্যাপার। স্বামীজীর কথাই ঠিক। সিগন্যাল ডাউন। ঘণ্টা বেজেছে। এবার একের পর এক নিজেকে উৎসর্গ করার পালা। তার জন্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত হওয়া দরকার।

কিন্তু পুঁটুদি? পুঁটুদি কোথায়? তাঁকে দেখা যাচ্ছে না কেন? কোথায় তিনি?

পুঁটুদি গিয়েছেন তাঁর ঘর-সংসার সামলাতে। ঘর-সংসারই বটে!

সংসারে এত বড় ঘর সামলানো বুঝি একমাত্র পুঁটুদির মত মেয়ের পক্ষেই সম্ভব।

চল মল্লিকা, এই ফাঁকে আমরা একবার চন্দননগর গিয়ে পুঁটুদির নতুন সংসারটা দেখে আসি।

মাত্র দুজনের সংসার। স্বামী আর স্ত্রী। স্বামী শশীভূষণ আচার্য কলকাতায় কি একটা কাজ করেন। সকালে বেরিয়ে যান। যাবতীয় কাজকর্ম শেষ করে আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসেন ধুঁকতে ধুঁকতে।

আর পুঁটুদি! ঘরকন্নার যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর। শুধু কি তাই। এখানেরই একটা স্কুলে তিনি আবার কাজ জুটিয়ে নিয়েছেন নতুন করে। সুতরাং দশটা বাজতে-না-বাজতেই ছুট্।

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর ফিরে আসতে আসতে সেই বিকেল পাঁচটা। তারপর আবার রান্নাবান্নার কাজ।

ছোট্ট সুখী সংসার। অন্তত বাইরের লোকের ধারণা তাই।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

তাহলে দুজনের জন্য এতগুলো ঘর কেন? এগুলো এমন করে সর্বক্ষণ তালা-বন্ধই বা থাকে কেন? কি আছে ওগুলোর মধ্যে?

কান পাত মল্লিকা। শুনতে পাচ্ছ ভেতরে কাদের যেন চাপা ফিসফিস আওয়াজ? চুপ। চুপ। এক্ষুণি সরে এস। আর এক পা-ও ওদিকে এগিয়ো না যেন। এক্ষুণি হয়তো একসঙ্গে গর্জে উঠবে অনেকগুলো পিস্তল।

ওঁরা কারা জান? যাঁদের নাম শুনলে গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, সেই চট্টগ্রাম সশস্ত্র-বিপ্লবের বীর সেনানী লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত, জীবন ঘোষাল প্রমুখ বিপ্লবীরাই ওখানে রয়েছেন আত্মগোপন করে।

তাঁদের নিরাপত্তার জন্যই একনিষ্ঠ কর্মী শশীভূষণ আচার্য ও পুটুদির দিনের পর দিন এই কষ্টকর অভিনয়। অর্থাৎ, বাইরের সবাই দেখুক যে, সহজ ঘরোয়া পরিবেশে একজোড়া সুখী দম্পতি ছাড়া এখানে আর কেউ নেই। কেউ থাকে না।

জীবনটা নাটক-নভেল নয়, মল্লিকা। দৃশ্যত স্বামী-স্ত্রী, প্রকাশ্য আচার-ব্যবহারেও কোন খুঁত নেই, একই বাড়িতে বাস, অথচ কেউ কারো নন। কতখানি প্রচণ্ড মনের জোর থাকলে যে একটি তরুণী মেয়ের পক্ষে এ পরিচয় মেনে নেওয়া সম্ভব, তা একবার ভাবতে পার ?

তুমি তো একালের সংস্কারমুক্ত মেয়ে। পার নিজেকে পুঁটুদির ভূমিকায় কল্পনা করতে ?

পুঁটুদি পেরেছিলেন। ভেঙে যেতে পারে, ভেসে যেতে পারে, মৃত্যু এসে যখন-তখন প্রাণটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারে, তা জেনেও সেদিন তিনি দৃঢ়পায়ে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন আপন লক্ষ্যের দিকে।

অবশ্য শেষপর্যন্ত কলকাতার সেই কুখ্যাত পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্টের হাতে সবাইকে ধরা পড়তে হয়েছিল একে একে।

পুঁটুদিও বাদ যাননি। অদৃষ্টে লাঞ্ছনাও জুটেছিল যথেষ্টই। তবু এ ব্যাপারে তিনি তাঁর মনোবল অটুট রেখেছিলেন শেষপর্যন্ত। সংসারে পুঁটুদিদের জাতই আলাদা। যাক, পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

একে একে সব কথাই শুনলেন কমলাদি। সংগ্রাম আসন্ন।

চট্টগ্রামে যে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বেজে উঠেছে, তা এখন থেকে বেজেই চলবে একটানা। বেজে চলবে বাংলাদেশের এখানে-ওখানে সর্বত্র। কমলাদিকে তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

শুধু ভূমিকা নিলেই চলবে না, তার জন্য সর্বাগ্রে তাঁকে বাবা-মায়ের স্নেহাঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হবে। নিতে হবে এমন এক জায়গায় যেখানে বাধা-নিষেধের কোন বেড়াজাল নেই।

দরকার হলে যে-কোন সময়ে, যে-কোন মুহূর্তে যেন যোগাযোগ করা যেতে পারে।

তাছাড়া অন্য কারণও আছে। সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে কে যে হারিয়ে যাবে, কে অবশিষ্ট থাকবে, আর কে ধরা পড়বে—তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

পুলিসী জুলুম থেকে অভিভাবকদের নিরাপত্তার প্রশ্নটাই তখন সব চাইতে বড় হয়ে উঠবে। তাই তাদের সান্নিধ্য থেকে এখন থেকেই যতটা সম্ভব দূরে থাকা প্রয়োজন।

ভাবনায় পড়লেন কমলাদি। কঠিন সমস্যা। অবশ্য বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে নিজেকে বাবা-মায়ের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিতে তাঁর এতটুকু আপত্তি নেই, কিন্তু আশ্রয় মিলবে কোথায়?

কলকাতা শহরে একটি বয়স্থা মেয়ের পক্ষে নিরাপদ আশ্রয় সংগ্রহ করা সোজা কথা নয়। অন্তত তখনকার দিনে।

এবারও উপায় বাতলে দিলেন সাত নম্বর বাড়ির সেই দোতলার মেয়ে কল্যাণী দাস।

গড়পারে মেয়েদের জন্য তাঁদের যে নতুন হোস্টেল খোলা হয়েছে, তার জন্য একজন লেডি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট প্রয়োজন। ইচ্ছে করলেই ওটা পাওয়া যেতে পারে। ও তো নিজেদের হাতের মধ্যেই রয়েছে।

হাতে যেন চাঁদ পেয়ে গেলেন কমলাদি। আর দেরি নয়। বাবা যে-কোন মুহূর্তে দার্জিলিং থেকে ফিরে আসতে পারেন। তার আগেই লেডিজ হোস্টেলে গিয়ে কায়েম হয়ে বসা প্রয়োজন।

ঠিক তাই। মাকে সঙ্গে নিয়ে পরদিনই বাবা হোস্টেলে এসে হাজির। কণ্ঠে তাঁর সকাতর মিনতি,—ফিরে চল্ মা।

বুভুক্ষু পিতৃহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহের সম্ভাষণ। সে স্নেহে কোন খাদ নেই।

কিন্তু কি উত্তর দেবেন কমলাদি! দেবার আছেই বা কি!

এমন স্নেহপ্রবণ বাবা সত্যিই হয় না। তাঁর কোন কাজে

কোনদিন তিনি বাধা দেননি। কোন কঠিন কথাও কোনদিন বলেননি।

আজ তাঁর এই ব্যাকুলতার উত্তরে কিছু বলার মত সাধ্য তাঁর কোথায়?

তবু বলতে হবে। উপায় কি! জীবনের গতি পরিবর্তন করা যে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

—চুপ করে থাকিসনে মা! কণ্ঠে কাতরতা ঝরে পড়ল সুরেন্দ্রবাবুর, অন্তত আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ।

—আমাকে কয়েকটা দিন সময় দাও বাবা। অনেক ভেবে-চিন্তে দুদিক রক্ষা করলেন কমলাদি, এখানে এতগুলো মেয়ে এখন আমার রক্ষণাধীনে রয়েছে। একটা ব্যবস্থা না করে ওদের ফেলে আমি যাই কি করে?

তাই তো! যুক্তিটা অস্বীকার করতে পারলেন না সুরেন্দ্রবাবু। এতগুলো মেয়েকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না। খুব সত্যি কথা। অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা। দায়িত্বটা দেখতে হবে তো!

যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল কমলাদির। যাক, অন্তত কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। তারপর যা হয়, পরে দেখা যাবে।

তবু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। সংসারের চোখ নেই, কান নেই, কিন্তু দাবি আছে। সে দাবি মিটবে কি করে? তাই গোটা দুই টিউশনিও নিতে হল জোগাড় করে। নিজের খরচটা অন্তত চালাতে হবে তো!

কেন দলের মধ্যে হঠাৎ এই সাজ সাজ রব? এর মূল উৎস কোথায়?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে, মল্লিকা।

১৯২৭ সাল। দলের অন্যতম নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তখন বর্মার দুর্ভেদ্য বেসিন কারাগারে বন্দী। আরো একজন বিপ্লবীনায়ক সেদিন বন্দীজীবন যাপন করছিলেন বেসিন জেলে। তিনি হলেন— হরিকুমার চন্দ। ঐতিহাসিক দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার মস্তিষ্ক প্রখ্যাত বিপ্লবীনায়ক হরিকুমার চন্দ।

কথায় কথায় সব কিছুই জেনে নিলেন ভূপেনবাবু। বিশেষ করে বোমার খোল সম্বন্ধে। দক্ষিণেশ্বরে সেদিন প্রচুর বোমা তৈরি করা হয়েছিল খাঁজ-কাটা লোহার সেল দিয়ে। কোথায় পাওয়া যাবে এখন সেই সেলের নমুনা?

—বলা শক্ত। যাঁরা জানতেন, তাঁদের মধ্যে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরী আগেই প্রাণ দিয়েছেন ফাঁসি-মঞ্চে। বাকি সবাই বিভিন্ন কারাগারে বন্দী। তবে হুগলীর হামিদুল হকের কাছে হয়তো দু-একটা নমুনা পাওয়া গেলেও বা যেতে পারে।

বুকের মধ্যে নামটা ভাল করে গেঁথে নিলেন ভূপেনবাবু। হামিদুল হক। হুগলীর হামিদুল হক।

কিছুদিন পরেই তিনি মুক্তি পেলেন বন্দীজীবন থেকে। তখনও কিন্তু বুকের মধ্যে সেই একটি নামই ঘুরপাক খেতে লাগল বার বার। হামিদুল হক। হুগলীর হামিদুল হক।

১৯২৮ সাল। কলকাতা কংগ্রেস শেষ। তারপরই সাজ সাজ রব শুরু হল বিভিন্ন বৈপ্লবিক দলগুলির মধ্যে। সংগ্রাম আসন্ন। আরো অস্ত্র চাই। অনেক অস্ত্র।

শুরু হল অস্ত্র সংগ্রহের কাজ। রিভলবার, পিস্তল ও কার্তুজ তার মধ্যে প্রধান।

কিন্তু টাকা! কোথায় পাওয়া যাবে এত টাকা? এ তো আর দু-দশ টাকার ব্যাপার নয়! বিস্তর টাকার প্রয়োজন।

টাকা পেলেই বা কি! অস্ত্র কোথায়? টাকা দিলেই যে সময়মত তা পাওয়া যাবে, তার গ্যারান্টি কোথায়?

না, এভাবে পরের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে আর চলবে না। অস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা যেমন চলছে, চলুক। তবে সেই সঙ্গে অন্য কিছু ব্যবস্থার কথাও এখন থেকে ভাবতে হবে।

ঠিক হল, বোমা তৈরি করা হবে। মারাত্মক বিধ্বংসী বোমা।

কোথায় পাওয়া যাবে তার ফরমূলা? কে দেবে তার পথ-নির্দেশ?

—আমি দেব। এগিয়ে এলেন বাঘাযতীনের সহকর্মী প্রবীণ বিপ্লবী যোগেন দে সরকার, গোটাকয়েক ডাক্তারী-পড়ুয়া কেমিস্ট-ছাত্র আমাকে দাও, যে রহস্য একমাত্র সামরিক-বাহিনী ছাড়া কেউ জানে না, আমি তোমাদের সেই মারাত্মক টি. এন. টি. বোমা তৈরির ফরমূলা শিখিয়ে দেব।

একে একে এসে জড় হলেন ডাঃ নারায়ণ রায়, তাঁর খুড়তুতো ভাই গোবিন্দ রায়, সীতাংশু সরকার প্রমুখ বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। আমরা রাজি। বলুন, কি করতে হবে আমাদের!

শুরু হল বোমা সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ। প্রথমে একাত্তর নম্বর মীর্জাপুর স্ট্রীটের মেসবাড়িতে। পরে আরো দু-এক জায়গায়।

মন্ত্রগুপ্তি হিসেবে যোগেন দে সরকার বরাবরই থাকতেন নেপথ্যে। শিক্ষার্থীদের যা কিছু নির্দেশ দেবার, সবই দিতেন দলের অন্যতম নায়ক ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, অরুণ গুহ বা কালীপদ ঘোষের মাধ্যমে।

কাজ এগিয়ে চলল অবিশ্বাস্য গতিতে। কখনো ল্যাবরেটরিতে, কখনো বা বাড়িতে।

কিন্তু সেল? কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল, কিন্তু সেল না হলে চলবে কি করে? সেল কোথায়?

অজ্ঞাতেই কখন নামটা মনে পড়ে গেল ভূপেনবাবুর। হামিদুল হক। হুগলীর হামিদুল হক। যে করে হোক, তার কাছ থেকে একটা নমুনা সংগ্রহ করতেই হবে।

অনেক খুঁজে-পেতে সে-সময়ের একটা সেল জোগাড় করে দিলেন হামিদুল হক,—এই নিন। এ ছাড়া আর কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই আমার কাছে।

দেখে এতটুকুও খুশি হতে পারলেন না যোগেন দে সরকার। যেমন বড়, তেমনিই ভারি। এ জিনিস পকেটে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না। লোহার মতই শক্ত অথচ হাল্‌কা ছোট জিনিস চাই। এলুমিনিয়াম হলে ভাল হয়।

যোগাযোগ করা হল ডাঃ ভূপাল বসুর সঙ্গে। কি করা যায় এখন? চেনা-জানা আছে কি তেমন কারো সঙ্গে?

ভূপাল বসু আবার যোগাযোগ করলেন নীলাদ্রি চক্রবর্তীর সঙ্গে। ওঁর বাবার একটা কারখানা রয়েছে। দেখা যাক, ওখানে কিছু তৈরি করা সম্ভব হয় কিনা!

তাই হল। অর্ডার মত প্রচুর এলুমিনিয়ামের সেল একদিন বেরিয়ে এল সেই কারখানা থেকে। তবে ভেতরের খবর কারখানার কাউকেই জানানো হল না। বলা হল—এগুলো এক ধরনের খাঁজ-কাটা চাকা, যা স্পিনিং মিলে ব্যবহার করা হয়। স্পিনিং মিলের জন্যই এগুলো প্রয়োজন।

নারায়ণ রায়ের নেতৃত্বে অবশেষে সেই সেলগুলি একদিন আমাটোল দিয়ে ভর্তি করে, ফিউজ লাগিয়ে টি. এন. টি. বোমা তৈরির কাজ শেষ হল। একটি দুটি নয়, তৈরি হল শত শত বোমা।

দেখতে দেখতে আর এক জীবন শুরু হল কমলাদির। কখনো টিউশনি, কখনো হোস্টেল সুপারিনটেণ্ডেন্ট, কখনো বা দলীয় প্রয়োজনে বিচিত্র সব ভূমিকা।

ঐ গাঁয়ের বধূটিকে দেখেছ, মল্লিকা! ঐ যে মস্তবড় এক ঘোমটা

টেনে হাতে একটা টিনের স্যুটকেস নিয়ে স্বামীর পেছনে পেছনে হেঁটে চলেছে!

নতুন জুতো পরে কেমন অনভ্যস্ত পায়ে থপ্‌থপ্ করে হাঁটছে দেখেছ! নিশ্চয় কোন দেহাতি মেয়ে। সবেমাত্র হয়তো গাঁ থেকে এসে 'শহুরে' হয়েছে।

কিন্তু ওহে বুড়ো হাবাতে মিনসে! তুমি কেমন ধারা মরদ বাপু! নিজে তো দিব্বি বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে আগে আগে মজা করে যাচ্ছ। পেছনে কচি বউটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখতে হয় তো! অতবড় একটা ভারি স্যুটকেস নিয়ে জনাকীর্ণ শহরের রাস্তায় পথ চলা কি চাট্টিখানি কথা!

মল্লিকা, ঘোমটা খুলে দেখবে নাকি একবার বউটির মুখ! না থাক, কমলাদি লজ্জা পাবেন।

কিন্তু হাতে ঐ অতবড় স্যুটকেস কেন? কি আছে ওটার ভেতরে? চুপ! জানতে চেও না ওসব।

আরে! ইনি আবার কে?

ঈস্! প্রসাধনের কি ঘটা! তা, হাল্‌কা হাওয়ার রঙীন-পাখা প্রজাপতির মত শাড়ির আঁচল উড়িয়ে কোথায় চলেছেন ইনি ট্যাক্সি করে?

নিশ্চয় কোন ওপরতলার মেয়ে। যা মেকআপ!

কিন্তু না। সেই মুখ। সেই পরিচিত চলন। ঠোঁটের কোণে হাসিটাও ঠিক তেমনি। এতটা তো ভুল হবার কথা নয়!

বিশেষ করে সঙ্গে রয়েছে সেই একই ধরনের স্যুটকেস। নিশ্চয়ই কমলাদি না হয়েই যান না। স্যুটকেস মানেই কমলাদি।

তবে সহসা চেনা যায় না। নানা বেশ। নানা পরিচয়। কখনো শাড়ি। কখনো ঘাগরা। কখনো বা ওড়না-দোপাট্টা।

এ-সবের আড়াল থেকে আসল কমলাদিকে খুঁজে বের করা সহজ কথা নয়।

এমনকি যে চার্লস টেগার্টের চোখকে কেউ কোনদিন এড়াতে পারেনি, তার পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু ঐ টিনের স্যুটকেস কেন ?

কি রয়েছে ওর ভেতরে, যার জন্য এত সতর্কতা ? এত সাবধানতা ? এত পরিশ্রম ?

রয়েছে মারাত্মক টি. এন. টি. বোমা, যার গোপন তথ্য একমাত্র সেনা-বিভাগই জানে। আর জানে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশের এই বেপরোয়া যুবক-যুবতীর দল।

যোগেন দে সরকারের ফরমূলা অনুসারে এরই মধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে এমনি অসংখ্য বোমা। যথাস্থানে তা বিলি-ব্যবস্থার ভার পড়েছে কমলাদির ওপর। এত সতর্কতা শুধু তারই জন্য।

ওদিকে ভাবনায় পড়ে গেছেন সুদক্ষ প্রস্তুতকারকগণ।

এত বোমা কোথায় রাখা যায় ? একটা বিশ্বাসযোগ্য শক্ত ঘাঁটি চাই যে !

কেন, অত ভাবনার কি আছে ? কমলাদিই তো রয়েছেন ! তাঁর ওখানে রাখলেই তো হয় !

ফলে যা হবার, ঠিক তাই। হোস্টেল তো নয়, যেন একটা বোমার আড়ৎ।

তক্তাপোষের নিচে বোমা, টেবিলের ওপর বোমা, তাকের ওপর বোমা, আয়নার আড়ালে বোমা, তালাবন্ধ ভাঁড়ার ঘরে বোমা, শুধু বোমা—বোমা—আর বোমা !

ওদিকে হোস্টেলের মেয়েরা অবাক। কমলাদির ঘরে এত টিনের স্যুটকেস কেন ?

বাব্বা ! পা ফেলারও জায়গা নেই। তাছাড়া নিত্য-নতুন লোকের আনাগোনা। গোবেচারার মত এক-একজন আসে, আবার একটু বাদেই ফিরে যায় হাতে একটা টিনের স্যুটকেস নিয়ে।

কি ব্যাপার ! কমলাদি কি কোন স্যুটকেস কোম্পানির এজেন্সী

নিয়েছেন নাকি! নিশ্চয়ই তাই। তাছাড়া কমলালেবুরও বোধহয় এজেন্সী নিয়েছেন। নইলে প্রায়ই এমন বড় বড় ঝুড়িভর্তি কমলা-লেবু আসে কেন?

কমলালেবুই বটে! তবে অসতর্ক মুহূর্তে ঝুড়ির নিচের যে-কোন একটা কমলালেবু যদি ফেটে যেত, তবে এতগুলো মেয়ে-সমেত গোটা হোস্টেলটাই বুঝি সেদিন ধুলো হয়ে উড়ে যেত।

খুবই ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু উপায় কি! বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এটুকু ঝুঁকি যে নিতেই হবে।

প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত। এবার আঘাত হানবার পালা।

জানি, তার জন্য মূল্য দিতে হবে। দিতে হবে অনেক তাজা প্রাণ।

কোন দুঃখ নেই তার জন্য। মূল্য আমরা অতীতেও অনেক দিয়েছি। এবারেও দেব। বার বার দেব। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই মূল্য দেবার পালা আমাদের কোন-দিনই শেষ হবে না।

তাকিয়ে দেখ। তাকিয়ে দেখ একবার গোটা বাংলাদেশটার দিকে। প্রচণ্ড দমননীতির চাপে বিদগ্ধ বাংলার আত্মা আজ কাঁদছে। কাঁদছে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অসহায় নিপীড়িত মানুষ। আকাশে-বাতাসে সর্বত্র আজ কান্না ছাড়া বুঝি আর কিছুই নেই।

আর তাই দেখে খল খল করে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছে স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের কুখ্যাত প্রতিভূ ঐ চার্লস টেগার্ট। বাংলার এই বিপ্লব-আন্দোলনকে দমন করতে সে বদ্ধপরিকর। তার জন্য যে-কোনরকম হিংস্র পন্থা অবলম্বন করতেও সে পিছ-পা নয়।

শুধু দু-এক বছর নয়। এমনি করে সে বাংলার হৃৎপিণ্ডকে ক্ষত-বিক্ষত করে চলেছে বছরের পর বছর ধরে।

কি সে করেনি এই বাংলাদেশের বুকে বসে? কি করতে বাকি রেখেছে?

ওর হিংস্র নখরাঘাতের ফলেই তো বাংলা আজ রক্তস্নাত হয়ে উঠেছে এমন করে। হারিয়ে গেছে অসংখ্য তরুণ প্রাণ।

এবার তার জবাব দিতে হবে। উপযুক্ত জবাব।

লোকটার আকাশচুম্বী দম্ভকে এবার ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে। স্তব্ধ করে দিতে হবে ওর কণ্ঠ। সেই চরম মুহূর্ত আসন্ন।

শহীদ গোপীনাথ, এবার তোমার সেই অন্তিম বাসনা পূর্ণ করার লগ্ন সমাগত।

শহীদ গোপীনাথ!

শ্রীরামপুর ক্ষেত্রমোহন সাহা লেনের গোপীনাথ সাহার কণ্ঠই বছর কয়েক আগে একদিন সর্বাগ্রে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল দৃঢ়সঙ্কল্পে.— 'টেগার্টকে উপযুক্ত জবাব দেবার সমস্ত দায়িত্ব আমার। তার জন্য আমি প্রস্তুত। শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র।'

আচমকা একদিন সুযোগে পেয়ে গেলেন গোপীনাথ। তারিখটা ছিল ১৯২৪ সালের ১২ই জুন।

সেদিন সকালের দিকে গোপীনাথ গিয়েছিলেন গড়ের মাঠের দিকে বেড়াতে। ফেরার পথে 'হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসনে'র দোকানের কাছাকাছি আসতেই সহসা কি দেখে তাঁর চোখদুটো জ্বলে উঠল ধকধক করে।

কে? কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে শো-কেসের দিকে তাকিয়ে জিনিসপত্তর লক্ষ্য করছে কৌতূহলভরে?

টেগার্ট না। হ্যাঁ, তাই তো!

পিস্তল সঙ্গেই ছিল, তাই মুহূর্তও আর দেরি করলেন না গোপীনাথ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন উন্মত্তের মত। তারপরই তাঁর পিস্তল আগুন ছড়াতে শুরু করল—গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম!

দ্বিতীয় গুলিতেই শেষ, তবু কিছুতেই যেন আক্রোশ মিটতে চায় না গোপীনাথের। পর-পর সাতটা গুলি করে তিনি ঝাঁঝরা করে দিলেন টেগার্টের সর্বাঙ্গ। লোকটা অনেক রক্ত ঝরিয়েছে বাংলার মাটিতে। ওর ক্ষমা নেই।

ছুট! ছুট! ছুট! উদ্যত পিস্তল হাতে নিয়ে এবার পার্ক স্ট্রীট ধরে ছুটতে শুরু করলেন গোপীনাথ।

কিন্তু একি! কে তাঁকে অনুসরণ করছে পেছন থেকে! একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভার!

বেইমান! বেইমান! রক্তে যেন আগুন ধরে গেল গোপীনাথের। সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাঁর অগ্নিনালিকা অগ্নি-বর্ষণ শুরু করল— দ্রাম! দ্রাম! ব্যস্, স্টিয়ারিংয়ের ওপরেই মাথাটি লুটিয়ে পড়ল ট্যাক্সি-ড্রাইভারের।

আবার ছুট। পেছনে তেড়ে আসছে হিংস্র কুকুরের দল। এক্ষুণি সরে পড়া দরকার।

সামনেই একটা গাড়ি।

চোখের পলকে সেই গাড়িতে উঠে বসলেন গোপীনাথ।—শীগ্‌গির ওয়েলেস্‌লী স্ট্রীটের দিকে চলুন। কুইক!

কি বললেন! যাবেন না! দ্রাম! দ্রাম! ব্যস্, শেষ।

ছুটতে ছুটতে এবার ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে পৌঁছে গেলেন গোপীনাথ।

কিন্তু একি! আবার কে এল তাঁকে বাধা দিতে? একটা অফিসের দরোয়ান। দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

চার নম্বর শেষ। এবার! এবার কি করা যায়!

ঐ যে ওয়েলেস্‌লী ও রিপন স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা প্রাইভেট কার। ওটাতেই উঠে পড়া যাক।

এবার আর হল না। গোপীনাথের সামান্য অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে এবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন গাড়ির মালিক মিঃ এ. ডব্লিও. অগ্‌। সঙ্গে যোগ দিল জনকয়েক পুলিস কনস্টেবল।

গোপীনাথ ধরা পড়লেন একটা মসার পিস্তল, একটা রিভলবার ও বেশ কিছু কার্তুজ সঙ্গে নিয়েই। ওগুলোর সদ্ব্যবহার করার আর কোন সুযোগই তিনি পেলেন না।

যথাসময়ে গোপীনাথকে নিয়ে যাওয়া হল থানায়। সারা মনে তাঁর একটা কূলপ্লাবী আনন্দ। একটা বিপুল পরিতৃপ্তি।

টেগার্ট খতম। অনেক রক্ত সে ঝরিয়েছে বাংলার মাটিতে। এতদিনে তার পালা শেষ।

কিন্তু একি! বিস্ময়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন গোপীনাথ।

কে? কে? কে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে?

সেই মুখ! সেই কটা চোখ! সেই ধূর্ত চাউনি! কোথাও এতটুকু অমিল নেই। নিশ্চয় টেগার্ট। টেগার্ট না হয়েই যায় না!

সত্যিই তাই। চেহারায় অনেকটা সাদৃশ্য থাকলেও গোপীনাথ যাঁকে নিঃশেষ করেছেন, তিনি টেগার্ট নন, মিঃ আর্নেস্ট ডে। শাসনকুলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই নেই। দুর্ভাগ্য সত্যিই দুর্ভাগ্য!

যথাসময়ে আসামীকে হাজির করা হল চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের আদালতে।

গোপীনাথ নির্বিকার। কাঠগড়ায় সর্বক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন মাথা উঁচু করে। যেন কিছুই হয়নি।

পুলিসের মামলায় কোনদিনই সাক্ষীর অভাব হয় না। এক্ষেত্রেও হল না। অনেকেই সাক্ষী দিলেন। বললেন অনেক কিছুই। বলা বাহুল্য যে, তার প্রতিটি কথাই গোপীনাথের বিরুদ্ধে।

এবার সাক্ষীদের জেরা করবার পালা। আসামী পক্ষের উকিল কোথায়?

না, কেউ নেই। তার দরকারও নেই। কারণ, জেরা করবেন গোপীনাথ নিজেই।

জেরা শুনে গোটা আদালত স্তম্ভিত। কি সূক্ষ্ম আইনের

বিশ্লেষণ! কি মারাত্মক ধারালো যুক্তি! স্কুলের নবম শ্রেণীর ছেলে এমন অদ্ভুত তর্কজাল সৃষ্টি করার ক্ষমতা পেল কোথায়?

সব শেষে এল টেগার্ট। সেও দাখিল করল মস্তবড় এক ফিরিস্তি।

গোপীনাথ কোথা থেকে রিভলবার পেয়েছে, কে তাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছে, সব নাকি তার নখদর্পণে। বৌবাজারের কোন এক বিপ্লবী নেতার বাড়ি থেকে সে নাকি তাকে স্বচক্ষে বেরিয়ে আসতে দেখেছে।

—ব্লাফ! ব্লাফ! ব্লাফ! হা হা করে হেসে উঠলেন গোপীনাথ, সুদক্ষ পুলিস কমিশনার হলেও আসলে তুমি একটি ব্লাফ মাস্টার, জেনারেল টেগার্ট। না, কিছুই তুমি জান না। সব ব্লাফ। যা সত্য, তা আমার কাছ থেকেই তুমি জেনে নাও।

গোপীনাথের সেদিনের সেই বিবৃতি যেমন নির্ভীক, তেমনি চাঞ্চল্যকর। সিংহশাবক সিংহের মতই মাথা উঁচু করে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা।

—তুমি যা বলেছ, সব ব্লাফ। কেউ আমাকে রিভলবার দেয়নি। কেউ নির্দেশ দেয়নি। দিয়েছে আমার মন। তারই প্রেরণায় আমি এ কাজ করেছি। এ ব্যাপারে আমিই আমার দল। আমিই আমার নেতা। আমিই আমার সব কিছু। রিভলবারও সংগ্রহ করেছি আমিই। তারপর একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন আমি হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছি তোমাকে। আমার অনেকদিনের সাধ—তোমাকে আমি নিজের হাতে হত্যা করব। অনেকদিন আগেই করতাম, পারিনি তখন আমার মায়ের অনুমতি পাইনি বলে।

—দুঃখ! ক্ষণেকের জন্য বুঝি একটু ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন গোপীনাথ, তা দুঃখ একটু হয় বৈকি! দুঃখ হয়, ভুল করে একজন নিরপরাধ লোককে মেরেছি বলে। আর দুঃখ হয়, তোমার মত একজন ধূর্ত,

শয়তানকে মারতে পারিনি বলে। তবে তার জন্য আমার এতটুকুও ক্ষোভ নেই। কারণ, আমি জানি যে, আমার প্রতি রক্তবিন্দু ভারতের ঘরে ঘরে শত শত গোপীনাথের জন্ম দেবে। আমি বিশ্বাস করি যে, তারাই আমার এই অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবে। তাদের ওপরই আমি সেই দায়িত্বভার অর্পণ করে গেলাম।

সাজা হল প্রাণদণ্ড।

গোপীনাথ তেমনি নির্বিকার। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। ফাঁসিকে থোড়াই পরোয়া করেন তিনি। মৃত্যু যেন তাঁর কাছে একটা ছেলেখেলা মাত্র।

তারপর এল একদিন ১লা মার্চ। পৃথিবী থেকে গোপীনাথের শেষ-বিদায়ের দিন।

জেল-গেটের বাইরে শোকার্ত মূর্তিতে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবর্গ। সৎকারের জন্য শবদেহ যেন তাঁদের হাতে দেওয়া হয়, এইটুকুই শুধু তাঁদের দাবি।

না, দেওয়া হয়নি। এমনকি গঙ্গায় বিসর্জন দেবার জন্য তাঁর একটুকরো অস্থি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

বলা যায় না, ঐ একটুকরো অস্থি থেকেই যে শত শত গোপীনাথের জন্ম হবে না, তা কে বলতে পারে ?

শুধু একবায় নয়, এমনি করে বার বার টেগার্ট বেঁচে গিয়েছেন কপাল জোরে। প্রথমে একবার চেষ্টা করা হয়েছিল শ্যামবাজার অরফ্যানেজে। তারপর এ্যালফ্রেড থিয়েটারে। পরবর্তী চেষ্টা—গোপীনাথ। আবার চেষ্টা করা হল কিছুদিন বাদে। আশ্চর্য, আবার সেই ভুল! টেগার্ট ভ্রমে এবার হ্যারিসন রোডে যাঁর ওপর আক্রমণ চালানো হল, আসলে তিনি হলেন মিঃ ক্রম।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে। কিন্তু আজও গোপীনাথের সেই অন্তিম বাসনা পূর্ণ হয়নি। আজও সেই শয়তান টেগার্ট তার নির্মম রথচক্র চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে।

কিন্তু আর দেরি নয়। এবার তার ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব দিতেই হবে।

বল, কে নেবে সেই দায়িত্বভার ?

কে পূর্ণ করবে গোপীনাথের সেই অন্তিম বাসনা ? কে করবে ?

—আমি করব। দীনেশের সারামুখে দৃঢ় সঙ্কল্পের রেখা। চোখে সেই আগুনের ফুল্‌কি।

—বেশ, তবে তোমার একা যাওয়া চলবে না দীনেশ। তোমার পাশে আরো একজন থাকা দরকার সঙ্গী হিসেবে। বল, কে থাকবে ?

—আমি থাকব।

কার কণ্ঠ ? কে দাবি জানাল ?

কে আবার! সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে বন্ধু অনুজা ছাড়া কে আর এমন করে দাঁড়াতে পারেন দীনেশের পাশে!

—বেশ, তাই হবে। তবে কাজটা খুব সহজ নয়। লোকটা যেমন ধূর্ত, তেমনি দুঃসাহসী। যেমন তৎপর, তেমনি বিচক্ষণ। শত্রু হলেও ওর এই অদ্ভুত কর্মদক্ষতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং এ ব্যাপারে দূর থেকে সহায়তা করার জন্য আরো দুজনের যাওয়া দরকার। বল, কে কে যাবে ?

—আমি যাব! আমি যাব! দাবি জানালেন আরো দুজন। অতুল সেন আর শৈলেন নিয়োগী।

—বেশ, তবে তাই হোক। তোমরা প্রস্তুত হও। কবে, কখন, কোন্ রাস্তায় তোমাদের অ্যাকসন শুরু করতে হবে, তা যথাসময়ে তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে একটা কথা সব সময়ে মনে রাখবে যে, অত্যন্ত মারাত্মক জিনিস এই টি. এন. টি. বোমা। সময়ের একটু এদিক-ওদিক হলে বিপদ ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। ফিউজে আগুন ধরাবার জন্য কক্‌খনো যেন দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে চেষ্টা করবে না। কারণ, কার্যকালে অত প্রচুর সময় তোমরা পাবে না। তার চাইতে জ্বলন্ত সিগারেট অনেক বেশি কার্যকরী। ফিউজের গায়ে

জ্বলন্ত সিগারেট কোনরকমে একটু ছুঁইয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা ছুঁড়ে দেবে আপন লক্ষ্যের দিকে। এক মুহূর্তও যেন দেরি না হয়। তার জন্য দরকার হলে আজ থেকেই তোমরা সিগারেট খাবার অভ্যাসটা শুরু করে দেবে।

প্রতিটি কথা, প্রতিটি নির্দেশ সবাই শুনে নিলেন সমগ্র অন্তর দিয়ে।

সামনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে কে থাকবে, কে হারিয়ে যাবে, কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এ-সময়ে দলীয় নীতি মন্ত্রগুপ্তি ও অন্যান্য নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে অবিচলিত থাক প্রয়োজন। সৈনিকের ধর্মই তাই।

এবার শুরু হল টেগার্ট সম্বন্ধে খোঁজ-খবরাদি সংগ্রহের কাজ। কোথায় তার নাগাল পাওয়া যাবে? কখন?

কিছুটা খবর পাওয়া গেল দলের অন্যতম কর্মী শৈলেন নিয়োগীর কাছ থেকে। প্রায়ই তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন লালবাজারে। তিনিই কিছু কিছু খবর দিলেন টেগার্টের গতিবিধি সম্বন্ধে।

টেগার্ট নাকি রোজ বেলা এগারোটার সময় লালবাজারে গিয়ে থাকেন নিজের গাড়ি করে। গাড়ির চালক জনৈক পাগড়ীধারী ড্রাইভার। গাড়ির সঠিক নম্বর বলা শক্ত। কারণ, নম্বর প্রায়ই পাল্টানো হয়। একাধিক নম্বর উল্টে-পাল্টে ব্যবহার করা হয় কয়েকদিন অন্তর।

সমর্থন জানালেন দীনেশ আর অনুজা। হ্যাঁ, তাই। খবর পাকা আমরাও তা লক্ষ্য করেছি দূর থেকে।

অন্যতম নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্তর রিপোর্টও তাই। হ্যাঁ, পাক

খবর। আমিও একদিন ওয়াচ করে দেখেছি অলক্ষ্যে থেকে। এবার তাহলে প্রস্তুত হও তোমরা।

তার আগে দলের সংগঠনের দিকটা একবার চিন্তা করে দেখা দরকার। আঘাত করতে গেলে প্রত্যাঘাত আসবেই। হয়তো তার আগেও আসতে পারে। তেমন কিছু ঘটলে তখন জাল ফেলে সবাইকে টেনে তোলা মোটেই বিচিত্র নয়। সে অবস্থায় কে গ্রহণ করবেন এই বৈপ্লবিক সংস্থা পরিচালনার দায়িত্বভার? দলের অন্যতম নেতা মনোরঞ্জন গুপ্ত রয়েছেন মাদ্রাজে। কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে?

ঠিক হল, তেমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তখন দলের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়।

নিশ্চয়ই তুমি খুব অবাক হয়েছ মল্লিকা। ভাবছ, কি করে এটা সম্ভব! শ্রীযুক্ত রক্ষিত রায় অন্য দলের নেতা। তাঁর পক্ষে কি করে যুগান্তর দলের দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত।

সত্যিই শক্ত। বিশেষ করে আজকের দিনে। কারণ, আজকের দিনে দলটাই আসল কথা হল, আর সব কিছুই সেখানে গৌণ। সেদিনের অবস্থা ছিল ঠিক এর বিপরীত। ভুল বোঝাবুঝি ছিল। ঝগড়া-বিবাদও হত মাঝে মাঝে। কিন্তু লক্ষ্য ছিল একটাই। সে লক্ষ্য হল—দেশের স্বাধীনতা। তাই হাজার ভুল বোঝাবুঝি সত্ত্বে আসল কাজের বেলায় পরস্পর হাত মেলাতে তাঁরা কোনদিনও দ্বিধা করেননি। এ প্রসঙ্গে যুগান্তর দলের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত পরবর্তীকালে কি বলেছেন শোন:

'কথা উঠলো, আমরা চলে গেলে আমাদের দিকের সবাইকে কে দেখাশোনা করবে, কার ওপর সব ভার থাকবে।...আমার প্রস্তাব অনুযায়ী ভূপেনবাবুর (রক্ষিত রায়) সম্পর্কে সকলেরই সম্মতি

আসতে দেরি হল না।···ভূপেনবাবু শুধু কর্মী হিসেবেই হেমদার (সর্বাধিনায়ক : বি. ভি.) একান্ত আস্থাভাজন নন, মানুষ হিসেবেও তাঁর প্রতি আকর্ষণ প্রচুর। এবং তা না হবার হেতু ছিল না। আমারও তাঁকে ভাল লাগত।

···সে সময়কার প্রতিদিনের প্রতি কাজে সহযোগিতায় তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক হয়ে উঠেছে। গোপন কাজে তাঁর ধরন-ধারণ আমাকে একটা নিশ্চিন্ত নির্ভরশীলতা দিয়েছে। এখন আবার ভাবনা হয়েছে, আমি যদি হঠাৎ ধরা পড়ে যাই, তিনি কি সবদিকের সব ভার নিতে পারবেন?'

ভার নেবার আর কোন প্রশ্নই রইল না মল্লিকা। কারণ, তার আগেই তুই ভূপেন্দ্র একদিন ধরা পড়ে গেলেন পুলিসের বেড়াজালে। প্রথমে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। পরে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়। তারপরই সোজা বক্সা দুর্গ। শ্রীযুক্ত দত্তের ভাষায় :

'সবই ভেস্তে গেল। আমরা বক্সা যাবার কয়েকদিন পরে ভূপেনবাবু (রক্ষিত রায়)-কেও ওখানে পাঠিয়ে দিল। ক্রমে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে অনেককেই বিভিন্নস্থানে সরিয়ে দেয়। ওখানে এক যায়, আর আসে। ওটা হয়ে উঠল একটা পান্থশালা।'

[ইতিহাসের উপাদান : ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত : সাপ্তাহিক বসুমতী : ১৪ই এবং ২৬শে মে, ১৯৬৬ সাল]

তাড়াতাড়ি মাদ্রাজ থেকে ছুটে এলেন দলের অন্যতম নেতা মনোরঞ্জন গুপ্ত। এগিয়ে চলাই বিপ্লবীর সহজাত ধর্ম। সুতরাং, কে গেল, কে রইল, সেকথা এখন ভাবলে চলবে না। পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য সবাই প্রস্তুত হও। অবিলম্বেই।

মৌন অবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যা। দিনের কাজ শেষ। এবার বিশ্রামের পালা।

হঠাৎ কি ভেবে সেদিন রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' বইটি টেনে নিলেন কমলাদি।

বড্ড ধকল গেছে আজ সারাদিন। হঠাৎ জরুরী নির্দেশ এসে হাজির। অবিলম্বে গুদাম সাবাড় করতে হবে। সমস্ত টিনের স্যুটকেস পাচার করে দিতে হবে চিহ্নিত লোকদের হাতে।

কমলালেবুর ঝুড়ির ব্যাপারেও সেই একই নির্দেশ। এ কি কম পরিশ্রমের কাজ! যাক, এতক্ষণে সব কাজ শেষ। এবার নিরিবিলিতে একটু 'চয়নিকা' নিয়ে বসা যেতে পারে।

কয়েকটা নিঃসীম মুহূর্ত। তারপর একসময়ে 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি পড়তে পড়তে তন্ময়তার মধ্যে ডুবে গেলেন কমলাদি।

চমক ভাঙল পায়ের শব্দে। দীনেশবাবু এসেছেন। মাঝে মাঝে তিনি এখানে এসে থাকেন। কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে আবার একসময়ে ফিরে যান। এখান থেকে তাঁদের বাড়ির দূরত্ব সামান্যই। বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখা যায়।

—কি ব্যাপার? কমলাদিই সর্বপ্রথমে কথা বললেন, খুব ক্লান্ত বলে বোধ হচ্ছে! শরীর খারাপ নাকি?

—না, মা-র সঙ্গে দেখা করতে বসিরহাট গিয়েছিলাম। রাশি রাশি অবসন্নতা ঝরে পড়ল দীনেশের কণ্ঠে, ওখান থেকেই সোজা ফিরছি।

মনে মনে হাসলেন কমলাদি। এই একটি ব্যাপারে দীনেশবাবু এখনো সেই শিশুটিই রয়ে গেছেন। একটু ফাঁক পেলেই অমনি মায়ের কাছে ছুটে যাওয়া চাই। এমন মাতৃভক্ত ছেলে সত্যিই বিরল।

হঠাৎ কি দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কমলাদি।

আহারে-বিহারে দীনেশবাবু চিরদিনই অত্যন্ত সাত্বিক। মাছ-মাংস ভুলেও কোনদিন স্পর্শ করেন না। তাঁর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট কেন?

কই, আগে তো কোনদিনও দেখা যায়নি!

—খুব অবাক হয়েছেন নিশ্চয়ই! হাসলেন দীনেশ।

—তা একটু হয়েছি বৈকি! হাসলেন কমলাদিও, কোনদিন তো দেখিনি আপনাকে এভাবে।

—তা ঠিক। হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন দীনেশ, তবে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন জানেন তো! 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।' তাই একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিচ্ছি।

—হঠাৎ এই অভিজ্ঞতার প্রতি এত লোভ কেন? সহজভাবেই প্রশ্ন করলেন কমলাদি।

—লোভ স্বাভাবিক কারণেই। মানুষের জীবন ক'দিনেরই বা। এই আছে, পরমুহূর্তে হয়তো নেই। কখন কি হয়, কেউ কি তা জোর করে বলতে পারে?

কমলাদি অবাক। হঠাৎ এই জীবন-দর্শন কেন?

বোঝা যায় যে, কথাগুলোর মধ্যে কিসের যেন একটা ইঙ্গিত রয়েছে। কি ব্যাপার?

—মানুষের জীবনে বর্তমানটাই সব চাইতে বড় সত্য। একই-ভাবে বলতে লাগলেন দীনেশ, ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না। আজ এই মুহূর্তে এখানে রয়েছি, কাল কোথায় থাকব কে জানে! হয়তো আর কোনদিনই এখানে আসব না। জীবনে আর হয়তো দেখাও হবে না। হয়তো এতদূরে চলে যাব যে, আর কোনদিনই ফিরে আসব না।

—মানে! সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন কমলাদি, দেখা হবে না কেন? যাবেন নাকি কোথাও?

—না না, সে-সব কিছু নয়। তর্কের খাতিরে বলছি আর কি!

সহসা নিজেকে গুটিয়ে নিলেন দীনেশ। সৈনিক জীবন অতি কঠিন, কঠোর। তুচ্ছ ভাববিলাসিতার সেখানে কোন দাম নেই।

দলের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নিরলস কর্মী কমলাদি। বাপ-মায়ের স্নেহচ্ছায়া, সুখী গৃহকোণ ও নিজের নারী-জীবনের সাধ-কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছু ফেলে তিনি দূরে সরে এসেছেন দলের একান্ত প্রয়োজনে।

তবু আপাতত আর একটি কথাও নয়। দলের মন্ত্রগুপ্তি ও নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁকে মেনে চলতেই হবে। সৈনিকের ধর্মই যে তাই।

একই কথার অনুরণন চলছে তখন কমলাদির সারা মনে। কিন্তু কোন জিজ্ঞাসা নয়। কোন কথা নয়। তাই স্বাভাবিক কারণেই এই নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করলেন না তিনি।

তবে প্রশ্ন না করলেও একটা জটিল জিজ্ঞাসা কিন্তু বুকের মধ্যে জমা হয়ে রইল সর্বক্ষণ।

দীনেশবাবুর এই রহস্যময় কথাগুলোর অর্থ কি?

কেনই বা তাঁর এই পরোক্ষভাবে বিদায় চাইবার প্রচেষ্টা?

কোথায় যেতে চান তিনি?

শব্দহীন মন্থরতায় কেটে গেল মুহূর্তের পর মুহূর্ত। দুজনেই নিঃশব্দ। দুজনেই নিশ্চুপ।

—কি পড়ছিলেন এত মন দিয়ে? নীরবতা ভেঙে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন দীনেশ।

—রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব'। উত্তর দিলেন কমলাদি।

—যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব। মনে হল অনেক দূর থেকে, যেন আকাশের ওপার থেকে কথাগুলো ভেসে এল দীনেশের, সংসারে এই দাবির মূল্য কতটুকু! কবির ঐ ছোট্ট মানসকন্যাও সেদিন যেতে নাহি দিব বলে তার অবিসংবাদী দাবি জানিয়েছিল। ধরে রাখতে পারল কি? যেতে যে তাকে দিতেই হল।

কথাটা বলেই আচমকা সিঁড়ি-বেয়ে তরতর করে নেমে গেলেন

দীনেশ। আর ফিরেও তাকালেন না। সৈনিককে পেছনে তাকাতে নেই।

আর কমলাদি! অবাক বিস্ময়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন দীনেশের অপসৃয়মান দেহটার দিকে।

সারা মনে তাঁর অসংখ্য কথার ভিড়। অসংখ্য প্রশ্ন। কেন আজ দীনেশবাবুর এই অদ্ভুত ভাবান্তর? কোথায় এর রহস্য?

দোতলার মেয়ে কল্যাণীদিও কিন্তু সেদিন এই রহস্যের কোন উত্তর খুঁজে পাননি, মল্লিকা। কিছুদিন পূর্বে আমি তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলাম দীনেশ সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়ে। চিঠির উত্তরে তিনি কি লিখেছেন শোন:

'হঠাৎ সেদিন আমাকে দীনেশবাবু খবর দিয়ে ডেকে পাঠালেন হোস্টেলের ভিজিটার্স-রুমে। বরাবরই তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। সেদিনও মাত্র সামান্য কয়েকটি কথাই তিনি বললেন। বললেন, 'এবার থেকে আরো কাছে এসে কাজ করতে হবে। কেন একথা বললাম, তা দু-একদিনের মধ্যেই বুঝতে পারবেন।'

সেদিন সত্যিই বুঝিনি। অনেক ভেবেছি। তবু ঐ কথা ক'টির কোন অর্থই খুঁজে পাইনি। পেয়েছিলাম পরদিন। তারিখটা ছিল ১৯৩০ সালের ২৫শে আগস্ট।'

'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল
এসেছে আদেশ—
বন্দরের বন্ধন কাল হল শেষ।'

১৯৩০ সাল। ২৫শে আগস্ট। অগ্নিযুগের রক্তরাঙা ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন।

জনাকীর্ণ ডালহৌসী স্কোয়ার। চারিদিকে লোকজনের কর্মব্যস্ততা।

জনতার কোলাহল ও ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির আওয়াজে মুখর হয়ে উঠেছে গোটা অঞ্চলটা।

টেগার্টের গাড়িটা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে লালবাজারের দিকে। দূরত্ব কমে আসছে ক্রমশ।

দু'পাশে দেহরক্ষী নিয়ে ভেতরে স্তব্ধ হয়ে বসে টেগার্ট।

দু-চোখে তার উদ্যত তলোয়ারের শাণিত দৃষ্টি। সারা মনে কালো কুটিল হিংস্রতার বিষ।

চট্টগ্রাম বিপ্লবের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে এখনো কাউকেই তেমন ধরা যায়নি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে এদিকেই আত্মগোপন করে রয়েছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

যে করে হোক, তাদের ধরতেই হবে। চরম সাজা দিতে হবে। নইলে ভরাডুবি থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না।

ওদিক দুই বন্ধু দীনেশ ও অনুজা তখন প্রস্তুত। হাতে তাঁদের জলন্ত সিগারেট।

জীবনের অনেক মুহূর্ত, অনেক বসন্তবেলা তাঁদের এমনি পাশাপাশি কেটে গেছে। আজও তাঁরা সেই পাশাপাশিই এসে দাঁড়িয়েছেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে।

টেগার্টকে চরম সাজা দিতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই কুখ্যাত প্রতিভূকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে হবে।

বাংলার মাটি থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচাইতে বড় শত্রু এই হিংস্র শয়তানকে নিঃশেষ করে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তার জন্য যে-কোনরকম মূল্য দিতে তাঁরা প্রস্তুত।

অপর দুই সহকারী অতুল ও শৈলেনও প্রস্তুত। বেশ খানিকটা দূরে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার দুই বিপরীত প্রান্তে।

আর রয়েছেন কালীপদ ঘোষ। টেগার্টের গাড়ি দেখামাত্র তিনিই সবাইকে সঙ্কেত দেবেন ইসারাতে। তারপরই শুরু হবে আক্রমণ।

কয়েকটা স্তব্ধ প্রহর কেটে গেল এমনি করেই। শুধু প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা। স্তব্ধ প্রতীক্ষা ছাড়া আপাতত আর কিছু করণীয় নেই।

সহসা নিস্তরঙ্গ নদীর বুকে ঢেউ উঠল।

হ্যাঁ, সে এসেছে। ঐ—ঐ যে দূরে তার গাড়িটা বাঁক নিয়েছে। ঐ যে এগিয়ে আসছে একটু একটু করে।

আর দেরি নেই। শহীদ গোপীনাথ, এবার তোমার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করার লগ্ন আসন্ন। এই যে এসে পড়েছে। আরো কাছে। আরো!

জিরো আওয়ার। রেডি! অ্যাকসন প্লীজ! ওয়ান-টু-থ্রি!

নিমেষে উঁচু হয়ে উঠল দীনেশের হাতটা। পরক্ষণেই সে তীব্র আক্রোশে বোমাটাকে ছুঁড়ে দিল টেগার্টের গাড়িটাকে লক্ষ্য করে। অতুল ও শৈলেনও দুই প্রান্ত থেকে তাঁদের কর্তব্য শেষ করলেন যথাযথভাবেই।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল গোটা ডালহৌসী স্কোয়ারটা—বুম্! বুম্! বুম্-ম্-ম্-ম্!

শুরু হল চিৎকার চেঁচামেচি আর হৈ-হল্লা। যতদূর নজর যায় শুধু ভীত আতঙ্কিত পলায়নপর জনতা। পালাও! পালাও! বাঁচতে চাও তো এক্ষুণি পালাও। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।

ধোঁয়া সরে যেতেই পরিণতি লক্ষ্য করে উত্তেজনায় বলিষ্ঠ দেহটা ফুলে উঠল দীনেশের।

না, বোমাটা ঠিকমত লাগেনি। গাড়ির বাঁ দিকের দরজায় লেগে বাইরে ফেটে পড়েছে। ফলে, ড্রাইভারের ডান হাতটা জখম হয়েছে, কিন্তু টেগার্ট নিরাপদ।

আর একটা চাই। আর একটা। এক্ষুণি, এই মুহূর্তেই। এ-সুযোগ হারালে চলবে না।

কিন্তু অনুজা! তাঁর কি হল?

কি দুর্ভাগ্য! কি দুর্ভাগ্য! সামান্য দেরি হয়ে গেল তাঁর বোমাটা ছুঁড়ে দিতে, আর সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তাঁর গোটা দেহটা গেল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে।

ধোঁয়া সরে যেতেই দেখা গেল এক ভয়াবহ দৃশ্য। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে অনুজার পেট ফেটে গিয়ে তাঁর সমস্ত নাড়িভুঁড়ি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে এখানে-ওখানে সর্বত্র। দেখলেও যেন ভয় করে।

প্রাণপণ শক্তিতে দেহটাকে সোজা রেখে ঐ অবস্থার মধ্যেই অনুজা এগিয়ে গেলেন সামনের পার্কটাকে লক্ষ্য করে।

তবে বেশিক্ষণ নয়। হাত বাড়িয়ে কোনরকমে পার্কের একটা রেলিংকে সজোরে চেপে ধরে পরক্ষণেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন জীবনী-শক্তির অভাবে। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।

উন্মত্তের মত ছুটে গেলেন দীনেশ। রক্ত! রক্ত! নদীর মত বয়ে চলেছে রক্তের ধারা। অনুজা নেই। চিরদিনের সঙ্গী অনুজা হারিয়ে গেল। আর কোনদিন সে ফিরে আসবে না। কোনদিন সাড়া পাওয়া যাবে না। এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

সহসা কি দেখে চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলে উঠল দীনেশের। উদ্যত পিস্তল হাতে নিয়ে শিকারী কুকুরের মত তাঁরই দিকে ধেয়ে আসছে টেগার্ট। সঙ্গে তার দেহরক্ষার দল।

ত্রস্তে নিজের কোমরে হাত দিলেন দীনেশ। এই সুযোগ। অনেক মূল্য আজ দিতে হয়েছে এই শয়তানটার জন্য। হারাতে হয়েছে জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু অনুজাকে। এবারে কড়ায়-গণ্ডায় তার শোধ তুলে নিতে হবে।

কিন্তু সব বৃথা। এতক্ষণ বাদে দীনেশ উপলব্ধি করতে পারলেন যে, ভুলের মাশুল শুধু অনুজাকেই দিতে হয়নি। সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে তিনি নিজেও আহত হয়েছেন গুরুতরভাবে। পিস্তল তোলার মত এতটুকু শক্তিও আর তার অবশিষ্ট নেই।

মনে হয়, দেহের সমস্ত শক্তিকে কে যেন চুষে নিঙড়ে শেষ করে দিয়েছে।

তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে কোনরকমে রক্তাক্ত দেহে উঠে দাঁড়ালেন দীনেশ। চেষ্টা করলেন পলায়নপর জনতার ভিড়ে মিশে যেতে। জোর করে গেলেনও কিছুটা দূর, কিন্তু তারপরই হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন শক্ত মাটির বুকে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

ঝড়ের মত খবর ছড়িয়ে পড়ল মহানগরীর এখানে-ওখানে সর্বত্র।

সবার মুখে একই কথা। সাবাস! সাবাস! ছেলেরা দেখিয়েছে বটে!

টেগার্টের মৃত্যু হয়নি বলে কোন দুঃখ নেই। কারণ, মৃত্যুটাই বড় কথা নয়। এক টেগার্ট গেলে অন্য টেগার্ট আসবে। সেদিক থেকে সবাই এক। সবাই অভিন্ন।

আসল উদ্দেশ্য হল অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করা। হিংস্রতা ও পাশবিকতার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ আঘাত হানা। সেদিক থেকে এ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সার্থক।

এবার টেগার্টের বক্তব্য শোন। এ সম্বন্ধে সেদিনই সে এক রিপোর্ট পাঠাল গভর্ণরের কাছে।

'বেলা এগারোটার সময় গাড়ি করে ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট দিয়ে যাচ্ছিলাম। হ্যারল্ড কোম্পানির কাছাকাছি যেতেই গাড়ির পাশে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম।

শব্দটা বোমার, তাই তাড়াতাড়ি আমি নিচু হলাম পায়ের কাছে রাখা রিভলবারটা তুলে নেবার জন্য। ঠিক তখনই গাড়ির অপর পাশে আর একটা বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম।

ড্রাইভারকে বললাম গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে। নির্দেশমত ড্রাইভার দশ গজের মধ্যে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

লক্ষ্য করলাম, ডালহৌসী স্কোয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ঘুরে

লোকজন দৌড়ে পালাচ্ছে হেয়ার স্ট্রীটের দিকে। গাড়ি থেকে নেমে আমিও তাদের অনুসরণ করলাম। যেতে যেতে একজন রক্তাপ্লুত বাঙালী ছেলেকে দেখলাম রাস্তায় পড়ে যেতে।'

রক্তাপ্লুত ছেলেটি হলেন অনুজা। ডাক্তারী পরীক্ষায় তাঁর দেহে গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল মোট দশটি। তার মধ্যে ন-টিই দেহের বামদিকে। একটি বুকের ওপর।

দীনেশের আঘাত লেগেছে ডানহাতের মোট তিন জায়গায়। এক্সরে করে দেখা গেছে, তখনো দুটো বোমার টুকরো তাঁর ডান-হাতের মাংসপেশীর মধ্যে ঢুকে রয়েছে গভীরভাবে।'

মেঘে-রৌদ্রে মেশামেশি বৈরাগী অপরাহ্ন। মন উদাস-করা পরিবেশ।

সকাল থেকেই মনটা সেদিন ভাল নেই কমলাদির। কেমন যেন আনমনা ভাব।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেবলি মনে পড়ে দীনেশবাবুর সেই কথাগুলো।

ঐ হেঁয়ালিপূর্ণ কথাগুলোর মানে কি! এ কি কোন আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত!

অন্যমনস্কভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সহসা সাত নম্বর বাড়ির দিকে নজর পড়তেই কি দেখে তীব্র জিজ্ঞাসায় ভ্রু-দুটো কুঁচকে উঠল কমলাদির।

একি! দীনেশবাবুদের বাড়িতে এত পুলিস কেন? পুলিসে পুলিসে যেন ছেয়ে গেছে গোটা বাড়িটা। কি ব্যাপার?

ভাবনার পর ভাবনা। রাশি রাশি ভাবনা। নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে। কোথায় গেলে তার সদুত্তর পাওয়া যায়? কোথায়?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল রসিকদার কথা।

রসিকদার বর্তমান আস্তানা তাঁর অজানা নয়। কাছাকাছিই

এক জায়গায় তিনি রয়েছেন। তাঁর কাছে গেলে হয়তো সব কিছু জানা যেতে পারে।

মনস্থির করে সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মত বেরিয়ে পড়লেন কমলাদি আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। যেমন করে হোক, রসিকদাকে গিে ধরতেই হবে।

যথাস্থানেই রসিকদাকে পাওয়া গেল। সেইসঙ্গে আরো একজনকে পাওয়া গেল, যাকে কমলাদি আশাই করেননি।

পুঁটুদি। চন্দননগর থেকে তিনি এসেছেন কি একটা ব্যাপাে বসিকদার কাছ থেকে নির্দেশ নিতে। কাজ শেষ হলেই ফিে যাবেন।

একে একে সব কথাই খুলে বললেন রসিকদা।

বললেন, অনুজার মৃত্যুর কথা। বললেন, আহত অবস্থায় দীনেশে ধরা পড়ার কথা। বললেন, টেগার্টের তৎপরতার কথা।

অদ্ভুত লোক এই টেগার্ট। হাতের মুঠোয় এসে কেউ কখনো ফস্‌কে যেতে পারেনি তার জীবনে। এবারও পারেনি।

ইতিমধ্যেই নেপথ্য-নায়কদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়েছেন তার হাতে। বাকি যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও তার হাত থেকে এড়াতে পারবেন কিনা বলা শক্ত; শুধু ধরা পড়েননি দীনেশের অপর দুই সহকারী অতুল ও শৈলেন। পুলিস তাঁদের কোন সন্ধানই পায়নি।

স্থির চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন কমলাদি। সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত চেতনা যেন পাথর হয়ে গিয়েছে তাঁর।

দীনেশবাবুর সেই রহস্যময় কথাগুলো শুনে মনে মনে তাঁর কত সংশয়ই না জেগেছিল। আজ সব ধুয়ে-মুছে একাকার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হোস্টেলে ফিরে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন কমলাদি। নিজের সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করা দরকার। একটু অবসর প্রয়োজন। একটু নিরিবিলি মুহূর্ত। মানুষের সঙ্গবিহীন একটু নির্জন একাকীত্ব।

আর দোতালার মেয়ে কল্যাণীদি! তিনি তখন কোথায়? তাঁর চিঠির মধ্যেই তুমি এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে, মল্লিকা।

'আমি সেদিন মেয়েদের নিয়ে বড়বাজার গিয়েছিলাম পিকেটিং করতে। সেখানেই শুনলাম, কিছুক্ষণ আগে নাকি ডালহৌসী স্কোয়ারে পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্টের ওপর বোমা পড়েছে। দীনেশবাবু আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই ধরা পড়েছেন। আর নিহত হয়েছেন বন্ধু অনুজা সেন নিজের হাতেই বোমা বিস্ফোরণের ফলে।

কিছুদিন আগেই আমরা রামমোহন রায় রোডের বাড়ি ছেড়ে বালীগঞ্জের বাড়িতে চলে এসেছিলাম। খবর পেয়ে আর দেরি করলাম না। সঙ্গে সঙ্গেই পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে। কিন্তু তার আগেই টেগার্ট বিরাট একদল পুলিস নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেছে আমাকে ধরবে বলে।

রুখে দাঁড়াল ছোট বোন বীণা। বাবা তখন বাড়িতে নেই। আমিও নেই। এ অবস্থায় পুলিস কমিশনারই হোন, বা যেই হোন, কাউকে সে বাড়িতে ঢুকতে দিতে রাজি নয়।

আশ্চর্য, অতবড় দুর্ধর্ষ পুলিস কমিশনারের মুখ থেকে আর একটি কথাও শোনা গেল না। বাবা বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত দিব্বি তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন দলবল নিয়ে।

যথাসময়ে বাবা ফিরে এলেন বাড়িতে। তারপর সার্চ করতে গিয়ে বাড়ি-ঘর-দোর একেবারে একাকার। যাক, শেষ পর্যন্ত সেদিন টেগার্ট ফিরে গেলেন আমাকে না পেয়ে।'

রসিকদার আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দাঁড়াল। টেগার্টের বেড়াজালে অনেকেই ধরা পড়লেন একে একে।

ধরা পড়লেন ডাঃ নারায়ণ রায়। ধরা পড়লেন ডাঃ ভূপাল বসু।

ধরা পড়লেন যতীশ ভৌমিক, কালীপদ ঘোষ, সুরেন দত্ত, রোহিং অধিকারী, অদ্বৈত দত্ত, অম্বিকা রায় প্রমুখ সবাই।

এবার শুরু হল নির্যাতনের পালা। এ-ব্যাপারে টেগার্টের দক্ষত চিরদিনই অসাধারণ। কিন্তু তার এবারকার কার্যকলাপ যেন পূর্বেকা সুনামকেও ছাপিয়ে গেল।

সে কি অকথ্য দৈহিক নির্যাতন! বল, কে তোমাদের নেতা?

কে কে রয়েছে তোমাদের দলে? ভালো চাও তো এখনো বল

কে জবাব দেবে? নির্মম প্রহারে সবাই তখন জ্ঞানহারা। জবা দেবার মত শক্তি কারো আর অবশিষ্ট নেই।

কি, এখনো বলবে না? টেগার্ট ক্ষিপ্ত। মরিয়া। বেপরোয়া ওদিকে চট্টগ্রামে এতবড় কাণ্ড, তার ওপর এদিকে কিনা এ ব্যাপার!

তার চাইতেও মারাত্মক খবর এসেছে ঢাকা থেকে। ইনস্পেক্ট জেনারেল অফ পুলিস মিঃ এফ. জে. লোম্যান নিহত।

আততায়ী বিনয় বোস পলাতক। সুতরাং এদের কোনরক দয়া নয়। ক্ষমা নয়। নির্মমভাবে পিষে ফেলতে হবে এই রক্তবীজে ঝাড়গুলোকে। জীবনে আর কোনদিনই যেন ওর মাথা তুলতে পারে।

—চুপ করে রইলে কেন? ভাল চাও তো এখনো বল! বলা না! সিপাই, চালাও!

নির্যাতনের যতরকম পন্থা আছে কিছুই বাদ গেল না। ডা পেটাই, কম্বল ধোলাই, আঙুলে পিন ফোটানো, মলদ্বারে রু ঢোকানো সবই প্রয়োগ করা হল নির্মমভাবে।

তাতেও খুশি নয় টেগার্ট। শুধু চালাও, চালাও আর চালাও যত পার চালাও। নতুন করে চালাও। হাত ব্যথা হলে অন্যে দাও। তবু থামলে চলবে না।

জ্ঞান হারিয়ে ফেললেও রেহাই নেই। কতক্ষণ আর থাকা

এভাবে। এক সময়ে না এক সময়ে জ্ঞান ফিরে আসবেই। তারপর আবার চালাও। জোরসে চালাও। আউর জোরসে!

স্টপ! স্টপ! ফর গড্‌স সেক, প্লীজ স্টপ! আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন নেপথ্য-অধিনায়ক, আমি স্বীকার করছি। বোমা আমি তৈরি করেছি। দীনেশ ও অনুজাকে আমিই পাঠিয়েছি। কিন্তু এরা সব নির্দোষ। এদের সঙ্গে দলের কোনই সংশ্রব নেই। এদের ওপর যেন এভাবে নির্যাতন করা না হয়।

মনে মনে হাসল টেগার্ট। সে নির্বোধ নয়। এবার সে উঠে পড়ে লাগল আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী-সাবুদ সংগ্রহ করার ব্যাপারে। এদের চরম শাস্তি দিতে হবে। একটি লোকও যেন রেহাই না পায় আইনের হাত থেকে। মৃত্যুই ওদের একমাত্র যোগ্য শাস্তি।

দিনগুলি যেন দুঃস্বপ্নের মত আসে আর যায়।

ভাল লাগে না। কিছুই ভাল লাগে না কমলাদির। ইতিমধ্যে প্রায় বিশ দিন কেটে গেছে। খবর কোনদিক থেকেই শুভ নয়।

অনেকেই ধরা পড়েছেন পুলিসের বেড়াজালে। রোজই একটা না-একটা দুঃসংবাদ ভেসে আসছে। বেশ বোঝা যায় যে, এবার আর কারোরই রেহাই নেই। আজ হোক, কাল হোক, ধরা পড়তেই হবে।

মেয়েদের মধ্যেও ধরা পড়েছেন কেউ কেউ। শোভারাণী দত্ত, সত্যরাণী দত্ত, কমলা দাস, রেণু সেন সবাই ধরা পড়েছেন একে একে। কোথায় এর শেষ কে জানে!

একমাত্র ব্যতিক্রম রসিকদা। পুলিস আজও তাঁর কোন সন্ধান পায়নি। কতদিন যে তিনি এভাবে এড়িয়ে এড়িয়ে থাকতে পারবেন বলা শক্ত।

তবে কাজের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের এতটুকুও কমতি নেই। ভাঙা দল নিয়েই কাজ চালিয়ে যেতে হবে। দলের ওপর চরম আঘাত এসেছে বলে পিছিয়ে গেলে চলবে না।

এই কাজের প্রেরণাতেই সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়লেন কমলাদি।

একবার মানিকতলা যাওয়া দরকার। বিপ্লবী শিবশঙ্কর মিত্র ও গোবিন্দলাল ব্যানার্জী এখন ওখানেই একটা বাড়িতে আত্মগোপন করে রয়েছেন। রসিকদার নির্দেশে তাঁদের দেখাশোনা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন তাঁরই।

তাছাড়াও অন্য কারণ আছে। অবিলম্বে দেখা করার জন্য রসিকদা জরুরী খবর পাঠিয়েছেন। ওখানেই তিনি অপেক্ষা করবেন বলে জানিয়েছেন।

অদ্ভুত লোক এই রসিকদা। পার্টিই তাঁর সর্বস্ব। পার্টিই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান সবকিছু। সংসারে একমাত্র পার্টি ছাড়া আর কোনকিছুই বুঝি চিন্তা করতে পারেন না তিনি।

সেদিন অনেক কথাই বললেন রসিকদা।

কথা বলতে অবশ্য একটাই। পুলিস হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে-কোন সময়ে তাঁর ধরা পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তার আগেই যার যার কাজ বুঝে নিতে হবে। যত আঘাতই আসুক না কেন পার্টির কাজের যেন কোনরকম ত্রুটি না হয়।

কথাবার্তা শেষ করে একসময়ে উঠে দাঁড়ালেন কমলাদি। অনেক রাত হয়েছে, এবার হোস্টেলে ফেরা দরকার।

উঠে দাঁড়ালেন রসিকদাও। সারাদিন অভুক্ত। জ্বরে সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে। পা চলতে চায় না। তবু যেখানে হোক, কোথাও গিয়ে আজকের রাতটুকুর মত মাথা গোঁজবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

নিঝুম নিশুতি রাত্রি। পথে জন-প্রাণীর চিহ্নও নেই।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে একসময়ে মানিকতলা ব্রীজের ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন রসিকদা। সাবধানের মার নেই। পার্টির অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে।

প্রথম কাজ, আবার নতুন করে সংগঠন গড়ে তোলা। সুতরাং এ সময়ে কিছুতেই ধরা পড়লে চলবে না। যে করে হোক, গা-ঢাকা দিয়ে থাকতেই হবে।

সহসা কি দেখে রসিকদা চমকে উঠলেন দারুণভাবে। কে? কে?

আর কিছু বলার সুযোগ হল না। তার আগেই হিংস্র শিকারীর দল তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মত।

বাকি রইলেন শুধু কমলাদি। রসিকদার ধরা পড়ার খবর তখনো তাঁর অজ্ঞাত।

মৌন তমস্বিনী রাত্রি। কেউ জেগে নেই। মনে হয় গোটা পৃথিবীটাই বুঝি তলিয়ে গেছে নিঝুম ঘুমের অতলান্তে।

মানিকতলা থেকে ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে কমলাদিও ঘুমিয়ে পড়েছেন একসময়ে। গোটা হোস্টেলটাতে কেউ বুঝি আর জেগে নেই।

ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্…

দরজা খুলুন। কে আছেন ভেতরে! দরজা খুলুন শীগ্‌গির!

ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল কমলাদির। দেখতে দেখতে তাঁর সারা মুখে ফুটে উঠল একটুকরো রহস্যময় হাসি।

এ ডাকের অর্থ তাঁর অজানা নয়। এত রাত্রে মেয়েদের হোস্টেলে ঢুকে তাঁদের শান্তিভঙ্গ করার মত শিক্ষা বা রুচি অন্য কারোরই থাকতে পারে না। থাকা সম্ভবও নয়।

যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। এবার যেতে হবে।

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। হোস্টেলের এই মেমসাহেবটি সম্বন্ধে অনেকরকম কানাঘুষোই জমা হয়েছে তাদের দপ্তরে। সুতরাং আগে ভাল করে সার্চ করতে হবে, তারপর অন্য কথা।

তাই করা হল। তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করা হল হোস্টেলের প্রতিটি কামরা। এমন কি বাথরুম ও পায়খানাগুলোও বাদ গেল না। যা জাঁহাবাজ মেয়ে! কোথায় কি লুকিয়ে রেখেছে কে বলতে পারে!

কিন্তু সব বৃথা। না, কোথাও কিছু নেই। এমন কি সন্দেহজনক একটুকরো কাগজও নয়। সুতরাং বন্দিনীকে নিয়ে ফিরে চল এবার যথাস্থানে।

হোস্টেলের মেয়েরা সব অবাক। এই ব্যাপার! স্যুটকেস কোম্পানির এজেন্ট কমলাদির কিনা তলে তলে এত কাণ্ড! কিন্তু এভাবে তো তাঁকে যেতে দেওয়া চলবে না! তাঁদেরও একটা কর্তব্য রয়েছে বৈকি!

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলেন মেয়েরা সবাই। চট করে কিছু খাবার তৈরি করে কমলাদিকে খাইয়ে দিতে হবে। এর পরে কখন তাঁর খাওয়া জুটবে কে জানে! আদৌ জুটবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে!

এখানেই তাঁরা থামলেন না। খাবারের পালা শেষ করে কমলাদিকে গাড়িতে তুলে দিয়েই এবার তাঁরা সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন সমস্বরে,—বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্! আবার আসবেন কমলাদি। আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

আনন্দে আবেগে চোখে জল এসে গেল কমলাদির। ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক লাগে। পার্টি বা রাজনীতির সঙ্গে হোস্টেলের এই সব মেয়েদের কোন সংশ্রব নেই।

তবু এই যে ওঁদের শ্রদ্ধা, এই যে ভালবাসা, এ কি শুধুই ভাবপ্রবণ মনের উচ্ছ্বাস? এর কি কোনই ভিত্তি নেই?

ভিত্তি সত্যিই ছিল মল্লিকা। তখন যুগটাই ছিল এমনি। মনে পড়ে, কোন খদ্দর-পরিহিত লোককে দেখলে সেদিন কি অপরিসীম শ্রদ্ধাভরেই না তাকিয়ে থাকতাম। ভাবতাম—ঐ খদ্দরটার গায়ে হয়তো কত অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনীই না লেখা রয়েছে।

আজ সেদিন আর নেই। খদ্দর আজ আর কারো মনেই এতটুকু সাড়া জাগায় না।

যথাসময়ে কমলাদিকে হাজির করা হল ইলিসিয়াম রোডের গোয়েন্দা-বিভাগের সদর দপ্তরে। তারপর শুরু হল জেরা।

—রসিকবাবুকে আপনি চেনেন?

—না। কমলাদির সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—আমি যদি বলি, তাকে আপনি খুব ভাল করেই চেনেন!

—আপনি একবার কেন, একশোবার বলতে পারেন, তবে আমি তাকে চিনিনে।

—চেনেন না! হুম! আচ্ছা, দেখাচ্ছি। সিপাই, আসামীকে এখানে নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির করা হল রসিকদাকে।

কিন্তু এ কোন্ রসিকদা! সর্বাঙ্গ তাঁর রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত। মনে হয়, নির্মম প্রহারে কেউ যেন তাঁর দেহের সমস্ত হাড়-মাংস একাকার করে দিয়েছে।

দেখে বুকটা হাহাকার করে উঠল কমলাদির। আশ্চর্য, চেনাই যেন যায় না রসিকদাকে। মনে হয়, তাঁর দেহের ওপর দিয়ে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে।

অথচ রসিকদা রীতিমত অসুস্থ। গায়ে বেশ জ্বর। তা সত্ত্বেও রেহাই দেওয়া হয়নি তাঁকে।

—এই মেয়েটিকে দেখুন তো ভাল করে। এবার বলা হল রসিকদাকে।

—দেখেছি। রসিকদার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—দেখেছেন! আশার আনন্দে চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল বীরপুঙ্গবের, কবে দেখেছেন?

—কেন, এইমাত্র!

—ও, ইয়ারকি মারা হচ্ছে! তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল বীর-পুঙ্গব, সিপাই, জলদি নিয়ে যাও একে। ফাটকমে বন্ধ করো!

আবার জেরা। জেরার পর জেরা। একটানা জেরা।

—দীনেশ মজুমদারকে কদ্দিন ধরে জানেন?

—জানিনে। ছোট্ট করে বললেন কমলাদি।

—জানেন না? অথচ দীনেশ নিজে বলেছে যে, আপনার সঙ্গে তার যথেষ্ট পরিচয় আছে।

—বাজে কথা। তাকে আমি চিনিনে।

—চিনিনে! হুঁ, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি! বাধ্য হয়েই আঙুল এবার বাঁকা করতে হবে।

তাতেও লাভ হল না কিছুই। সেই একই উত্তর কমলাদির। কাউকে তিনি চেনেন না। কারো সঙ্গেই তাঁর পরিচয় নেই।

এবার এল স্বয়ং টেগার্ট। আশ্চর্য, স্থির অপলক দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত কমলাদির মুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সে সরে গেল অন্যত্র। কোন প্রশ্ন নয়। কোন কথা নয়। একেবারেই নিঃশব্দ, নিশ্চুপ।

এখানেই টেগার্টের বিশেষত্ব। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মাত্র একপলক তাকিয়েই সে বুঝে নিতে পারত ভেতরের আসল মানুষটাকে।

বুঝে নিতে পারত, কোথায় কতটুকু ঘা দিলে কার্যসিদ্ধি হওয়া সম্ভব। যেখানে আশা নেই, সেখানে বৃথা পণ্ডশ্রম করতে সে রাজি নয়।

কমলাদির বেলায়ও হল তাই। স্পষ্ট সে বুঝে নিল যে, হাজার ঘা দিয়েও এখানে কোন লাভ হবে না।

এর জন্যে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আঘাত করতে হবে এমন এক জায়গায়, যেখানে সবচাইতে বেশি বাজে মেয়েদের।

কাজেও তাই করা হল। খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন সুরেন্দ্রবাবু। সারা মুখ তাঁর বিবর্ণ, রক্তশূন্য।

যে ভয়টা এতদিন মনের আনাচে-কানাচে বাদুড়ের মত কালো ডানা মেলে ছিল, আজ সেই ভয়টা ভয়ঙ্কর রূপ ধরে একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। প্রাণাধিকা কন্যা আজ পুলিসের হাতে বন্দিনী। এ দুঃখ তিনি রাখবেন কোথায়?

মনে মনে হাসলেন জবরদস্ত পুলিস অফিসারবৃন্দ। এবার! এবার কোথায় যাবে বাছাধন? দেখা যাক, এবার বরফ গলতে শুরু করে কিনা!

একবার মাত্র তাকিয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন কমলাদি। দীর্ঘ আয়ত চোখে ক্লান্তিময় চাহনি। পাণ্ডুর বেদনার আভা। হতাশায় ভরা।

বাবার ঐ ছলছল চোখের ভাষা দেখে বেদনায় বুকটা মুচড়ে উঠলেও এ ব্যাপারে তিনি যে বড় নিরুপায়।

কন্যাকে নিরুত্তর দেখেও তার প্রতি আস্থার এতটুকুও অভাব দেখা গেল না সুরেন্দ্রবাবুর। বার বার তিনি বলতে লাগলেন একই কথা।

কমলা কোন অন্যায় করতে পারে না। অন্যায় করা কোন-দিনই তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে। শুধু শুধু তাকে আটকে না রেখে পুলিসের উচিত তাকে ছেড়ে দেওয়া।

বৃথাই স্নেহবুভুক্ষ পিতৃ-হৃদয়ের এই আকুল আবেদন মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল পাথরের দেয়ালে দেয়ালে। শাসকদের কাছে তার কতটুকুই বা দাম! তাই তাঁর চোখের ওপর দিয়েই তারা বন্দিনীকে নিয়ে আবদ্ধ করল পুলিসের গাড়িতে।

কিছুতেই যখন মুখ খুলবে না, তখন শুধু শুধু আর দেরি করে লাভ কি? তার চাইতে লালবাজারের পুলিস হাজতেই পাঠিয়ে দেওয়া যাক। বেশ জায়গা। খাসা থাকবে।

আর সুরেন্দ্রবাবু! স্থির অপলক দৃষ্টিতে তিনি শেষ পর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন চলমান সেই পুলিসের গাড়িটার দিকে। সংসারে সেই বিহ্বল করা দৃষ্টির বুঝি একটাই মাত্র অর্থ হয়।

এমনি করে দিনের পর দিন। সকাল ন-টা থেকে পাঁচটা গোয়েন্দা-দপ্তর, রাতটা লালবাজার থানা-হাজত।

হাজার রকম প্রশ্ন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। একে চেনেন? ওকে জানেন? অমুকের সঙ্গে পরিচয় আছে নিশ্চয়ই?

জবাব দিলেও রেহাই নেই। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আবার সেই প্রশ্ন। অসতর্ক মুহূর্তে একবার-না-একবার মুখ থেকে বেফাঁস কথা বেরিয়ে আসবেই। কত বাঘা বাঘা ছেলে এই করে ঘায়েল হয়ে গেল! এ তো অবলা মেয়ে! যাবে কোথায়?

মাঝে মাঝে রঙ বদলায়। তখন একেবারে অন্য চেহারা। আহা, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে! কিছু খাবে মা?

না না, লজ্জা কি! বাড়িতে তোমার বয়েসী আমারও একটি মেয়ে আছে। কি জানো মা, পুলিসই হই, আর যা-ই হই, আমিও এদেশের লোক। স্বরাজ আমিও চাই। নেহাত চাকরি করি বলে বাইরে তা প্রকাশ করতে পারিনে। তা বলে একই দেশের লোক হয়ে তোমার ক্ষতি করব, তা যেন তুমি ভুলেও মনে ঠাঁই দিও না, মা! শত্রু হলেও মানুষ তো। তা দীনেশবাবুর সঙ্গে তোমার যেন শেষ কবে দেখা হয়েছিল মা?

এমনি একটানা চৌদ্দ দিন, তবু রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হল না। রহস্য যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল।

এবার অন্য সুর ধরলেন মহাপ্রভুরা। ভবিষ্যতে আর এসব কাজ করবে না বলে লিখে দাও, এক্ষুণি ছেড়ে দেব।

ঘৃণায় মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন কমলাদি। কোন অন্যায় তিনি করেননি, সুতরাং লিখে দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

টোপ হিসাবে আবার নিয়ে আসা হল সুরেন্দ্রবাবুকে। তিনি একবার মেয়েকে বুঝিয়ে বলুন। তাঁর অনুরোধ হয়তো সে রাখলেও বা রাখতে পারে।

কিন্তু এ কোন্ সুরেন্দ্রবাবু? এ যেন আমূল পরিবর্তিত এক ভিন্ন সত্তা।

অসম্ভব। মেয়ে তাঁর বোকা নয়। সে শিক্ষিতা। বুদ্ধিমতী। ভালমন্দ বোঝার বয়েস তার যথেষ্টই হয়েছে। সেক্ষেত্রে জোর করে তার ওপর নিজের অভিমত চাপিয়ে দিতে তিনি প্রস্তুত নন।

মেয়ের মায়ের অভিমতও তাই। বার বার তিনি সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন স্বামীকে। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি নিরুপায়।

একটানা কথাগুলো বলেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন সুরেন্দ্রবাবু। নিশ্চিন্ত নির্ভরতার হাসি।

যেন হাসির মধ্য দিয়ে এ-কথাই তিনি বোঝাতে চাইলেন যে,—দুঃখ করিসনে মা, দুঃখ করিসনে। আমি জানি, তুই কোন অন্যায় করিসনি। দেশের মুক্তি চাওয়া মোটেই অন্যায় নয়। অন্যায় যদি হত, তবে সে অপরাধে আমিও যে অপরাধী। বেঙ্গলী কাগজের মাধ্যমে একদিন আমিও তো দেশের মানুষকে কম স্বাধীনতার বাণী শোনাইনি! তাহলে দুঃখ কিসের? না, দুঃখ আমি করব না। তুইও করিসনে।

প্রেসিডেন্সি জেল। ঢুকতে গিয়ে বিচিত্র এক অনুভূতিতে সারা দেহ ঝিমঝিম করে এল কমলাদির।

কত শহীদের পদস্পর্শে ধন্য প্রেসিডেন্সি জেল। এর প্রতিটি

ইট-পাথরের সঙ্গে মিশে আছে কতজনের কত আনন্দ-বেদনা, জীবনের কত সকাল-সন্ধ্যা। কান পাতলে এখনো বুঝি তাঁদের সাড়া পাওয়া যায়।

চমক ভাঙল হাসির শব্দে। পাহাড়ী ঝর্ণার মত কে যেন খিল খিল করে হেসে চলেছে একটানা।

কমলাদি অবাক। কে? কে? কে এমন করে হাসে? কেমন যেন চেনা চেনা বলে মনে হয়!

কে আবার! পুঁটুদি ছাড়া সংসারে কে আর এমন করে হাসতে পারেন? টেগার্ট তাঁর খেলাঘরের খেলা ভেঙে দিলেও মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারেনি কোনদিনও।

বিশেষ করে এখন তো আর কথাই নেই। জেলের নিঃসঙ্গ জীবনে এতদিন পরে সঙ্গী হিসেবে যখন কমলাদিকে পাওয়া গেছে, তখন আর তাঁকে পায় কে?

পুঁটুদি আজ আর বেঁচে নেই, মল্লিকা। মাত্র বছর চারেক আগে গড়িয়ায় এক আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন চিরদিনের মত। যাঁর হাসির শব্দে একদিন গোটা জেলখানাটা গমগম করত, সেই কলকণ্ঠ আজ স্তব্ধ।

বেঁচে নেই রসিকদাও। বছর দুয়েক আগে তিনি শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কলকাতার এক হাসপাতালে।

কমলাদি আজও আছেন। কোন কিছুই তিনি ভোলেননি। অতীতের সেই কথা। মনের খাতা ওল্টাতে গিয়ে আজও ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে আসে অতীতের সেই ধূসর পাণ্ডুলিপি। অস্পষ্ট, তবু অবিস্মরণীয়।

শুরু হল বিচারের প্রহসন।

দুটো মামলা। একটা কেবল মাত্র দীনেশের বিরুদ্ধে, অন্যটা বাদ বাকি সবার বিরুদ্ধে।

হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে মেয়েদের মামলায় জড়ানো সম্ভব হল না, তাই বাধ্য হয়েই তাঁদের ছেড়ে দিতে হল একে একে। কমলাদিও একদিন ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

আশ্চর্য, আদালতে দীনেশ একেবারে নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। দু-চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। কিছুটা অসহায়তারও।

ঘুরে-ফিরে সেই একই চিন্তা ঘুর্ণি হাওয়ার মত তাঁর মনের গভীরে ঘুরপাক খেতে থাকে বার বার। অনুজা নেই। সর্বক্ষণের সঙ্গী অনুজা আজ আর তার পাশে নেই। সম্পদে বিপদে কোনদিনই আর সে তার পাশে এসে দাঁড়াবে না। কোনদিন তার সাড়া পাওয়া যাবে না। সে হারিয়ে গেছে।

ঘুম নেই বড়ভাই অবিনাশ মজুমদারের চোখে। ইতিমধ্যেই তাঁকে সাত নম্বর রামমোহন রায় রোড়ের বাড়ি ছেড়ে নেমে আসতে হয়েছে রাস্তায়। কারণ তিনি দীনেশ মজুমদারের ভাই।

এমনকি কোন হোটেলে পর্যন্ত তাঁর স্থান নেই। সবাই পুলিসের ভয়ে থরথর কম্পমান। হাজার হোক দীনেশ মজুমদারের ভাই। তাকে আশ্রয় দিয়ে শেষে কি সাধ করে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনব নাকি! কাজ নেই বাপু ওসব ঝামেলা দিয়ে!

তবু সব কিছু তুচ্ছ করে মামলা চালাতে লাগলেন অবিনাশ-বাবু। সর্বস্ব যায় তো যাক, তবু যে করে হোক, মেনিকে বাঁচাতেই হবে। মেনি যে তাঁর বড় আদরের! কল্যাণীদির চিঠির ভাষায়:

'বড়দা অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মানুষের বাড়ির রকে শুয়ে শুয়ে

ভাইয়ের জন্য মামলা চালাতেন। সে কি দুঃসহ অবস্থা তখন তাঁর! আশ্রয় বলতে কিছু নেই। তবু তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন।'

রায় দেওয়া হল দিনকয়েক বাদেই। তখনকার সময়ের সাময়িক পত্রিকা থেকেই সে খবর এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

দীনেশচন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

'আলিপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারে কলিকাতার পুলিস কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টের অন্যতম আক্রমণকারী বলিয়া অভিযুক্ত শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

দীনেশচন্দ্র শান্তভাবেই দণ্ডাদেশ গ্রহণ করেন। যুবকটির বয়স মাত্র ২২ বৎসর। দীনেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্র ছিলেন।

[ভারতবর্ষঃ কার্তিক, ১৩৩৭ সাল]

এবার শোন দ্বিতীয় মামলার কথা। এ-মামলার জন্য বিশেষ-ভাবে গঠিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হলেন মিঃ এইচ্, সি, স্টর্ক। বাকি দুজন আশুতোষ ঘোষ এবং আদিত্যুজ্জমান খান।

অভিযোগ,—বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ রাখা, ইউরোপীয়ান ও পুলিস কর্মচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি।

নীলাদ্রি চক্রবর্তী, যার বাবার কারখানায় বোমার সেল তৈরি করা হয়েছিল, তাকে আসামীর তালিকা থেকে রেহাই দিয়ে ডাকা হল সাক্ষী হিসেবে।

তাছাড়া রাজসাক্ষী হল আরো দুজন। সীতাংশু সরকার আর ব্রজদুলাল সেন। সাধারণ সাক্ষী প্রায় শতাধিক। পরের কাহিনী সংবাদপত্রের পাতা থেকেই এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

কলিকাতা বোমার মামলায় কঠোর দণ্ডাদেশ

'গতকল্য আলিপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে কলিকাতা বোমা ষড়যন্ত্রের মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। ১০ জন আসামীর মধ্যে ৮ জনের উপর ১০ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে। আসামী অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও শরৎচন্দ্র দত্ত মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

দণ্ডের বহর

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় এম. বি, কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলার। ইনি ও ডাঃ ভূপাল বসু এম. বি. উভয়েই ২০ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রসিকলাল দাস ১৫ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

যতীশচন্দ্র ভৌমিক ও অম্বিকাচরণ রায়, ওরফে—নন্দ ও আদিত্য-চরণ দত্ত ১২ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

রোহিণীকান্ত অধিকারী ১০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।'

[আনন্দবাজার : ২৮শে নভেম্বর, ১৯৩০ সাল]

মামলার রায়ে আরো বলা হল যে, ৭১নং মির্জাপুর স্ট্রীট ও সরস্বতী প্রেস হচ্ছে মূলকেন্দ্র, যেখান থেকে এই ষড়যন্ত্রের প্রেরণা এসেছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, অরুণ গুহ ও মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ যুগান্তর দলের নেতৃবৃন্দ।

আপীলে অবশ্য কিছুটা হেরফের হল। সেখানে ডাঃ নারায়ণ রায় ও ডাঃ ভূপাল বসুর হল পনেরো বছর। সুরেন দত্তর বারো

বছর। যতীশ ভৌমিকের দু-বছর। আর প্রমাণাভাবে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হল রসিক দাস, অদ্বৈত বর্মণ ও অম্বিকা রায়কে।

তবে এ মুক্তি মুক্তি নয়। তাই জেল-গেটেই আবার গ্রেপ্তার করা হল রসিক দাসকে। তারপর বিনা বিচারে আটক করে রাখা হল একটানা আট বছর।

অদ্বৈত বর্মণ ও অম্বিকা রায়ও রেহাই পেলেন না সেই অভিশাপ থেকে। তাঁদেরও আটক করে রাখা হল সেই একইভাবে।

অন্যতম নেতা মনোরঞ্জন গুপ্ত তখন পলাতক। তবে বেশিদিন নয়। মাস তিনেক বাদে তিনিও একদিন ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিকভাবে। ধরা পড়লেন না গোবিন্দ রায়। পুলিস তাঁর কোন হদিসই পেল না।

নিরালা নির্জন ঘরে ভাগ্যের মর্মান্তিক পরিণতির কথা ভেবে দিনগুলো কেটে যায় কমলাদির।

মনে পুঞ্জ পুঞ্জ কান্নার মেঘ জমে উঠেছে, কিন্তু সে বেদনার ভাগ দেওয়া চলবে না কাউকেই। সে দুঃখ তাঁর একার।

কত কথা ভিড় করে আসে মনে। একটার পর একটা। অনেক কথা। অনেক আবেগ।

কোথায় গেল সব? কোথায় সেই মুক্তিকামী সহকর্মীর দল?

কেউ নেই। কেউ নেই। তাঁর কল্পনার ওপরে নির্মম মুঠিতে একটা যবনিকা টেনে দিয়ে একে একে সবাই আজ চলে গেছেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। নির্বান্ধব পৃথিবীতে আজ তিনি নিঃসঙ্গ। একা।

'যেতে নাহি দিব।'

হাসি পায়। কথাটা মনে হলে সত্যিই আজ হাসি পায়।

ঠিকই বলেছিলেন দীনেশবাবু। সংসারে এ দাবির কোন মূল্য নেই। যেতে দিতে না চাইলেও এখানে যেতে দিতে হয়। কই, কাউকেই তো তিনি ধরে রাখতে পারেননি! সবাইকেই তো যেতে দিতে হল!

হয়তো একদিন আবার সবাই ফিরে আসবেন। দ্বীপান্তরের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে দীনেশবাবুও হয়তো একদিন জীবনের সায়াহ্ন বেলায় ফিরে আসবেন তাঁর আপনজনের কাছে। হয়তো দেখাও কোনদিন হবে।

কিন্তু আজকের এই বিদ্রোহী যৌবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনার কিছুমাত্রও কি সেদিন অবশিষ্ট থাকবে তাঁর চেতনার সরোবরে!

কে জানে! হয়তো থাকবে। হয়তো বা থাকবে না।

কিন্তু কেন? কি তার অপরাধ?

দেশপ্রেম তো অন্যায় নয়! দেশের মুক্তিকামনা তো অপরাধ নয়!

তাহলে কেন আজ দেশের মুক্তিকামী তরুণ-তরুণীর দল এই অন্যায় নির্বাসন দণ্ড মাথা পেতে নেবে? কেন? কেন?

ভাবতে ভাবতে একসময়ে কালো চোখে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল কমলাদির।

আমি প্রতিশোধ নেব। আজ হোক কাল হোক বা যেদিন হোক, সহপাঠী, বন্ধু ও গুরু দীনেশবাবুর প্রতি এই অন্যায় নির্বাসন-দণ্ডের প্রতিশোধ আমি নিশ্চয়ই নেব। নেবই।

'আমি প্রতিশোধ নেব!'

গর্জে উঠলেন আরো একজন। অতুল সেন। দীনেশের সেই অপর সহকারী অতুল সেন।

টেগার্টের হাতে একে একে সবাই ধরা পড়লেও অতুল সেন ও অন্য সহকারী শৈলেন নিয়োগীর পাশ কাটিয়ে যেতে এতটুকুও কষ্ট হয়নি। পুলিস তাঁদের কোন সন্ধানই পায়নি। জানেও না কিছু। সুতরাং মোটামুটি তাঁদের নিরাপদ বলা চলে।

তবু শান্তি নেই অতুল সেনের মনে। লজ্জা! লজ্জা! কি দুঃসহ লজ্জা!

এত করেও টেগার্টকে শেষ করা গেল না, এ-দুঃখ, এ-লজ্জা সে রাখবে কোথায়?

অনুজা ও দীনেশের ঐ পরিণতি দেখে কেন সে সেদিন অমন করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল?

কেন সে দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল না টেগার্টের ওপর?

যদিও সেই দায়িত্ব তার ছিল না, তবু ঘটনার পরিণতি দেখে সে তো তখন ইচ্ছে করলেই শেষ করে দিতে পারত ঐ শয়তানটাকে এমন সুযোগ যে জীবনে আর কোনদিন পাওয়া যাবে না!

না, পিছিয়ে গেলে চলবে না। সুযোগ পেতেই হবে। আজ হোক, কাল হোক সুযোগ করে নিতে হবে। মাত্র একটা সুযোগ।

সেদিন সে প্রমাণ করে দেবে যে, অতুল সেন মৃত্যুকে কোনদিনও ভয় পায় না। কবে আসবে সেদিন? কবে?

দেখতে দেখতে পৃথিবীর ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল দুটো বছর।

ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে বাংলাদেশে। ক্রমশ ভারি হয়ে উঠেছে ইতিহাসের পাতা।

ডালহৌসী স্কোয়ারের ঘটনার ঠিক চারদিন পরেই (২৯শে আগস্ট) বাংলার ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অফ পুলিস এফ. জে. লোম্যান নিহত হয়েছেন ঢাকাতে। আততায়ী বিনয় বসু পলাতক।

৮ই ডিসেম্বর সেই বিনয় বসুই আবার ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন

কলকাতার প্রাণকেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে ঢুকে। সঙ্গে ছিলেন দীনেশ ও বাদল। কারা-বিভাগের অধিকর্তা কর্নেল সিম্পসনকে প্রাণ হারাতে হয়েছে অব্যর্থ গুলীর আঘাতে।

৭ই এপ্রিল, ১৯৩১ সাল, প্রাণ দিয়েছেন মেদিনীপুরের কুখ্যাত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট জেমস্ পেডি। আততায়ী বিমল দাশগুপ্ত এবং যতীজীবন ঘোষ নিখোঁজ।

২৭শে জুলাই প্রাণ দিতে হয়েছে আলিপুরের ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ আর. আর. গার্লিককে। আততায়ী কানাই ভট্টাচার্য বরণ করে নিয়েছেন ইচ্ছামৃত্যু।

১৪ই ডিসেম্বর নিহত হয়েছেন কুমিল্লার জেলা-শাসক স্টিভেন্স। আততায়ী শান্তিসুধা ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

দীনেশ তখন মেদিনীপুরের জেলে। যে কারণেই হোক, তখনো পর্যন্ত তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়নি।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে দিনের পর দিন একা থেকে থেকে ইতিমধ্যে পৃথিবীর রূপটাই বুঝি ভুলে গেছেন দীনেশ।

একই রঙ নিয়ে আসে ভোরের সূর্য, স্তব্ধ দুপুর আর শান্ত বিকেল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত সব কিছুর যেন একই রূপ।

ভাল লাগে না। ভাল লাগে না এই নিয়মের রাশটানা নিরানন্দ জীবন।

মাঝে মাঝে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। পুরনো দিনের ছন্দ। পুরনো মানুষের কথা।

মনে পড়ে অনুজাকে। কোথায় আজ অনুজা? অনুজা আজ আর পাশে নেই। আর কোনদিনই সে পাশে এসে দাঁড়াবে না। চিরদিনের মতই সে হারিয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে পাঁচিল টপকে বাইরের দু-একটা টুকরো টুকরো কথা কানে আসে।

রসিকদা মুক্তি পেয়েও রেহাই পাননি। কোথায় আছেন তিনি এখন ? কোন্ জেলে ?

'যেতে নাহি দিব।'

একা একাই হাসতে থাকেন দীনেশ। মানুষের কি অসম্ভব আশা! কি অসম্ভব দাবি! ভেঙে যেতে পারে, ভেসে যেতে পারে, তবু মানুষের আশার যেন আর শেষ নেই। এই আশা নিয়েই তারা বেঁচে থাকে চিরকাল।

কেমন আছেন এখন কমলাদি ?

তিনি কি পার্টির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এখনো ? কে জানে!

এমনি করে দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।

ভাল লাগে না। অসহ্য লাগে। কোথাও পালাতে ইচ্ছে করে। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। সাংঘাতিক একটা কিছু করতে ইচ্ছে করে। তারপরই আবার সব স্থির। কোথায় যাবে সে ? কোথায় পালাবে ?

ভাবনা থেকে রেহাই পাবার জন্য মাঝে মাঝেই সে তখন দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দেয় বাইরের দিকে।

দূরে—বহুদূরে। যতদূরে দেখা যায়। পাঁচিল পেরিয়ে আকাশের দূরদিগন্তে। ক্লান্ত বিক্ষত বিষণ্ণ হৃদয়ে এমনি করে শুধু চেয়ে থাকা দিনের পর দিন। তাছাড়া আর কিছু নেই।

এদিকে নিজের চারপাশে একটা বিপুল পরিব্যাপ্ত শূন্যতার আবিষ্কারে মনে মনে তখন ভয় পেয়ে গেছেন কমলাদি। দারুণ ভয়।

কি আছে আজ তাঁর জীবনে! অতীতের সঞ্চয় বলতে মনের মণি-কোঠায় আঁকা আছে শুধু পুঞ্জীভূত ব্যথা-বেদনার ইতিহাস। জমার ঘরে শূন্য। শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে।

এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতাকে ভুলতে গিয়েই এবার তিনি নিজেকে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে দিলেন মুরলীধর স্কুলের শিক্ষিকার কাজে। এই ক'রে যদি ভুলে থাকা যায় সব কিছু।

প্রথমে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত এই নিয়ে আর কোনই আপত্তি করলেন না পিতা সুরেন্দ্রবাবু।

থাকুক, এই নিয়েই ও থাকুক। অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে। এবার এই নিয়েই ও একটু শান্তিতে থাকুক।

কোথায় শান্তি! কোথায় সুখ!

নিয়মের রাশটানা ছক-বাঁধা জীবন। একটি একটি করে শুধু আসে ম্লান দিন, আর অনেক বিষাক্ত মুহূর্ত।

চারিদিকে এত হাসি, এত আলো-গান, কিন্তু বুকের মধ্যে কোথায় যে একটা কান্নার পাখি ডানা ঝাপ্‌টে মরে, সে খবর কেউ জানে না।

তবু স্কুলের কচি কচি মেয়েদের কলকাকলির মধ্যে দিনটা কোন-রকমে কেটে যায়, কিন্তু বিপদ হয় রাত্রে। একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, শুধু তাঁর চোখেই ঘুম নেই। চোখ বুজে আসে, তবু ঘুম আসে না।

মাঝে মাঝে মনের মধ্যে তর্জনী তুলে কে যেন শাসায়,—কি হল! দেশপ্রেমের অপরাধে তোমার সহকর্মীরা সবাই তো আজ দণ্ড ভোগ করছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। তাদের কি তুমি ভুলে গেলে?

ভুলে গেলে সহপাঠী, বন্ধু ও গুরু দীনেশকে?

কি হল সেই শপথের?

কোথায় তোমার সেই প্রতিশোধ?

না না, আমি ভুলিনি। অস্থির হয়ে বিছানায় উঠে বসেন কমলাদি। তাঁদের আমি এতটুকুও ভুলিনি। কোনদিন ভুলব না। প্রতিশোধ। প্রতিশোধ আমি নিশ্চয়ই নেব। সুযোগ পেলেই হয়।

এমনি করে কেটে যায় প্রহরের পর প্রহর। রাতের পর রাত।

কমলাদি অস্থির চঞ্চল। বেশ বোঝা যায় কিসের যেন একটা দুর্বার নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে।

মনের গহনে কি যেন একটা অস্পষ্ট সম্ভাবনা আকার পরিগ্রহ করবার দুর্বার বাসনায় দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে।

দুর্জয় তার আহ্বান। বিচিত্র তার আকর্ষণ। অমোঘ তার শক্তি। প্রতিশোধ। প্রতিশোধ চাই। চাই একটা সুযোগ।

হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। একেবারে অযাচিতভাবেই।

সেদিন একটা জরুরী প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন কমলাদি। সাত নম্বর বাড়ির সেই দোতলার মেয়ে সহপাঠী কল্যাণী দাসের জেল হয়েছে। তাদের বাড়ি একবার যাওয়া কর্তব্য।

ঘটনাটা ঘটল সেখানেই।

কথাবার্তা শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই সহসা কি দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল কমলাদির গতি। স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে কল্যাণীর ছোটবোন বীণা দাস। বেশ বোঝা যায় কি যেন সে বলতে চায়।

—আমাকে কিছু বলবে বীণা? প্রশ্ন করলেন কমলাদি।

—হ্যাঁ, বলব। দ্বিধাগ্রস্তের মত বললেন বীণা দাস, একটা জিনিস চাইব আপনার কাছে। আমি জানি, আপনিই একমাত্র লোক, যিনি আমাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন। বলুন, যা চাইব দেবেন?

—নিশ্চয় দেব। হেসে জবাব দিলেন কমলাদি, কল্যাণীর বোন তুমি। তাছাড়া আমার নিজেরও স্নেহের পাত্রী। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই। বল কি চাও?

—একটা রিভলবার।

—রিভলবার! বিস্ময়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন কমলাদি।

অতি ভাল মেয়ে এই বীণা দাস। যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনি

মিষ্টি ওর কথাবার্তা। পড়াশোনাতেও চমৎকার। ডায়োশেসন কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে সম্প্রতি বি. টি. পড়ছে।

তাছাড়া অসাধারণ ওর কাব্যপ্রতিভা। কবি হিসেবে এরই মধ্যে ও পরিচিত মহলে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। কলম ছেড়ে কবির হঠাৎ এই রিভলবারের দিকে ঝোঁক কেন?

—ফেব্রুয়ারির ছ' তারিখে আমাদের কনভোকেশন। চ্যান্সেলার হিসেবে গভর্ণর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন আসবে তার ভাষণ দিতে। সুযোগ পেলে আমি তাকে—কথাটা আর শেষ করলেন না বীণা দাস।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কমলাদি। এ কোন্ বীণা! এ তো সেই চিরদিনের ভাল মেয়ে বীণা নয়! কল্যাণীর মত ওর চোখের তারায়ও যে আজ সেই আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে!

—ভাল মেয়ে বলে আমার কি দেশসেবার কোন অধিকার নেই? আমাকে কি পিছিয়েই থাকতে হবে চিরদিন?

সেদিনের মত ফিরে এলেন কমলাদি। কথাটা ভাল করে ভেবে দেখা দরকার।

নিজে তিনি যুগান্তর পার্টির বিশিষ্টা সভ্যা। কিন্তু বীণা অন্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। তাঁকে তিনি রিভলবার দেবেন কোন্ অধিকারে? কিসের যুক্তিতে?

তবে কি এমন অপূর্ব সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে? তাই বা কি করে সম্ভব!

ভাবনার পর ভাবনা। কি করা যায় এখন?

আগে হলে কথা ছিল না, কিন্তু দলের প্রতিটি নেতৃস্থানীয় কর্মী এখন কারাগারে। কেউ বাইরে নেই। এমনকি, এ ব্যাপারে কারো সঙ্গে একটু বুদ্ধি-পরামর্শ করার মত পর্যন্ত কেউ অবশিষ্ট নেই। সিদ্ধান্ত যা করবার, নিজেকেই করতে হবে। এমন সিদ্ধান্ত করতে হবে, যাতে দলীয় সম্মান এবং ঐতিহ্য যেন পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ থাকে।

ভাবতে ভাবতে একসময়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন কমলাদি :

আচ্ছা, ভূপেনবাবু (দত্ত) এ সময়ে কাছে থাকলে কি করতেন ?

কি সিদ্ধান্ত নিতেন সহপাঠী, বন্ধু ও গুরু দীনেশ মজুমদার ?

রসিকবাবু বা মনাদা (মনোরঞ্জন গুপ্ত)-ই বা কি বলতেন বীণার এই আবেদনের উত্তরে ?

কি সিদ্ধান্ত নিতেন পরমশ্রদ্ধেয় হরিকুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি ব্যানার্জী, কিরণ মুখার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ? তাঁরা কি এ সুযোগ গ্রহণ করতেন না বাইরে থাকলে ?

নিশ্চয়। সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু ধরা পড়ার পরে পুলিসের নির্যাতন সইতে না পেরে বীণা যদি তখন স্বীকারোক্তি করে ? যদি বলে দেয় সব ?

না, বলবে না। বলতে পারে না। ওর ঐ চোখের আগুন মিথ্যে নয়।

কিন্তু রিভলবার ! কোথায় পাবেন তিনি এখন রিভলবার ? প্রতিটি সহকর্মী রয়েছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। এ অবস্থায় রিভলবার সংগ্রহ করা সোজা কথা নয়।

সুধীরকে একবার বললে কেমন হয় ? অদ্ভুত ছেলে এই সুধীর। অদ্ভুত বেপরোয়া তার কর্মদক্ষতা।

বয়েসে অবশ্য খুবই ছোট। বেশ কিছু ছোট। তা বলে কাজের ব্যাপারে সে ছোট নয়।

বরং এক একসময় তার কর্মদক্ষতা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। নিঃসঙ্গ জীবনে এই সুধীরই আজ তাঁর ভাই, বন্ধু, সখা, সবকিছু। তার কাছেই আবার তিনি লাঠি খেলা শিখতে শুরু করেছেন নতুন করে।

কথাটা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন সুধীর ঘোষ। এ চান্স কিছুতেই মিস্ করা চলবে না কমলাদি। রিভলবারের জন্য ভাববেন না। সে দায়িত্ব আমার। কিন্তু কিছু টাকা চাই যে।

এই নাও টাকা।

হাসিমুখে বেশ কিছু টাকা এগিয়ে দিলেন ছাত্রীসঙ্ঘের বিশিষ্টা সভ্যা, সহপাঠিনী সুলতা কর। কিছু জিজ্ঞেসও করলেন না। জানতেও চাইলেন না। দরকার কী! কমলা যখন চেয়েছে, তখন ভেতরে কিছু একটা রহস্য আছে নিশ্চয়ই। চিনতে তো আর ওকে বাকি নেই!

কার্যোদ্ধার করে নাচতে নাচতে ফিরে এলেন সুধীর। গুড নিউজ কমলাদি। এই নিন আপনার রিভলবার।

যথাসময়ে সেই মহামূল্য জিনিসটি কমলাদি তুলে দিলেন বীণা দাসের হাতে।

কিন্তু ট্রেনিং! একটু ট্রেনিং চাই যে! কাজটা খুবই শক্ত। দিনকাল ভাল নয়। একটু জোরে আওয়াজ হলে আর রক্ষে নেই। সুতরাং চল রামমোহন লাইব্রেরীর তিনতলার ঐ চিলেকোঠায়।

আজ ছুটির দিন। কেউ নেই আশে-পাশে। দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে যতটা সম্ভব দেখে নাও এই ফাঁকে।

কিন্তু, আরো একটা কাজ করতে হবে। সর্বাগ্রে বাড়ি ছেড়ে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে হোস্টেলে গিয়ে উঠতে হবে।

কি লাভ বাবা-মাকে পুলিসী হাঙ্গামার মধ্যে জড়িয়ে। সুতরাং চলো এবার হোস্টেলে।

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২ সাল।

ঘড়ির কাঁটাটা একটানা বেজে চলেছে টিক্‌টিক্‌-টিক্‌টিক্‌-টিক্‌টিক্‌।

বোধহয় তার চাইতেও জোরে বেজে চলেছে কমলাদির নিজের হৃৎপিণ্ডটা। সময় নেই। সময় নেই। সময় নেই।

কেটে গেল আরো কিছুক্ষণ। কমলাদি অস্থির, চঞ্চল। একটা

দমবন্ধ মুহূর্ত যেন ভয়ঙ্কর এক সম্ভাবনাকে ক্রমশই কাছে টেনে আনছে। দেরি নেই। দেরি নেই। দেরি নেই।

কিন্তু বীণা যদি পিছিয়ে যায়? যদি সব মিথ্যে হয়ে যায়?

না, তা হবে না। হতে পারে না। বীণার ঐ চোখের আগুন মিথ্যে নয়। বিপ্লবের ইতিহাসে কেবলমাত্র মেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠিত আজকের এই তারিখটাকে নিশ্চয় সে স্মরণীয় করে রাখবে।

এমনি করে কতক্ষণ কেটে গেল ঠিক নেই। তারপর হঠাৎ এক-সময়ে ঝড়ের মত ছুটে এলেন সুরেন্দ্রবাবু:

—কমলা! কমলা! হ্যাঁরে, বীণাকে তুই তো চিনিস?

—কোন্ বীণা? বুকের মধ্যে কম্পন শুরু হল কমলাদির, তবু তিনি জোর করে হাসির রঙ ফুটিয়ে তুললেন সারা মুখে।

—আমাদের বেণীবাবুর মেয়ে। উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলেন সুরেন্দ্রবাবু, তোর ক্লাসফ্রেণ্ড কল্যাণীর বোন। কি করেছে জানিস? এইমাত্র খবর পেলাম, সিনেট হলে সে নাকি স্বয়ং গভর্ণরকে গুলী করেছে। ভাগ্যিস টের পেয়ে মাথা নিচু করে নিয়েছিল, নইলে কি যে হত! এখন মেয়েটার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!

নিশ্চল পাষাণের মত বসে রইলেন কমলাদি। কোন সাড়া নেই। নিমীলিত দুটি চোখ। শুধু মাঝে মাঝে ঠোঁটদুটি কাঁপছে অল্প অল্প।

বেশ বোঝা যায় যে, ঘটনার পরিণতি চিন্তা করে বাবার মন আজ আবার নতুন করে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু নিজের মন যে খুলে দেখাবার নয়। সেখানে বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ চলছে আজ। সে দুঃখ কাউকে দেখানো যায় না। বোঝানো যায় না। সে দুঃখ তাঁর একার।

এবার সিনেট হলের কথা শোন।

সকাল থেকেই সিনেট হলের আশে-পাশে সেদিন সাজ-সাজ রব। সেপাই-সান্ত্রী, গোয়েন্দা-টিকটিকি, কত যে এসে জড় হয়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। সপারিষদ গভর্ণর এসেছেন ভাষণ দিতে। চাট্টিখানি কথা তো আর নয়!

মোট ৬৯০ জন স্নাতক সেদিন সিনেট হলে উপস্থিত হয়েছেন ডিগ্রি নেবার জন্য। আর রয়েছেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি গ্রহণ করবেন জগত্তারিণী পদক।

গভর্ণরের একপাশে বসেছেন শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন। অন্যপাশে উপাচার্য ডঃ হাসান সুরাবর্দী। যুদ্ধ-ফেরত লোক। লেঃ কর্নেল বলেই তিনি বেশি পরিচিত।

সামনের সারিতে বিশেষ অতিথিদের মধ্যে রয়েছেন মেয়র, স্পীকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যবৃন্দ।

যথাসময়ে গভর্ণর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন শুরু করলেন তাঁর বক্তৃতা। মাত্র কিছুক্ষণ, তরপরই হঠাৎ কান ফাটানো শব্দ—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

ত্বরিতে টেবিলের নিচে আত্মগোপন করলেন লাট বাহাদুর। সর্বনাশ! আগুনে মেয়ের হাতে আগুনে রিভলবার! ঐ রিভলবারের সামনে লাট সাহেবের লাটে উঠতে কতক্ষণ!

উপাচার্য লেঃ কর্নেল সুরাবর্দী প্রথমে বুঝে উঠতে পারেননি ঘটনাটা। পরে যখন দেখতে পেলেন কনভোকেশন গাউন পরা একটি মেয়ে গুলী চালাচ্ছে, তখন একলাফে গিয়ে জাপটে ধরলেন তাকে। আরো অনেকেই ছুটে গেলেন তাঁকে সাহায্য করতে। সংবাদপত্র থেকেই তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি:

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় বাঙ্গলার লাটের উপর গুলী

'গতকল্য শনিবার দিন অপরাহ্নে সিনেট হাউসে এক বিষম কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। ৪॥ ঘটিকার সময় বাঙ্গলার গভর্ণর বাহাত্নর যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কনভোকেশন সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন, সেই সময় ডায়োসেশান কলেজের বীণা দাস নাম্নী মহিলা গ্র্যাজুয়েট গভর্ণরকে বিষমভাবে আক্রমণ করে। গভর্ণর দৈবক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছেন। একথা জানিতে পারিয়া তত্রত্য জনতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।...

ঘটনার পূর্বের অবস্থা

৩-১৫ মিনিট হইতে কনভোকেশনের কার্য যথারীতি আরম্ভ হইয়া ৪-২৪ মিনিট পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই চলে। সেই সময় একজন ভারতীয় মহিলা গ্র্যাজুয়েটের একাডেমিক গাউনের খস্‌খস্‌ শব্দ শুনিতে পাইয়া সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয়। ঐ গ্র্যাজুয়েট যুবতী একটু অগ্রসর হইয়া আসে এবং মুহূর্তের মধ্যে পর পর ৪টি গুলী গভর্ণরকে লক্ষ্য করিয়া করে।

গভর্ণরকে বাহাত্নর কয়েক পা পিছাইয়া সৌভাগ্যক্রমে ডানদিকে কাত হইয়া পড়িয়া যান। সেই সময় সমগ্র জনতার মধ্যে একটা বিষম উদ্বেগের ভাব প্রকাশ পায়।

ধোঁয়ার মধ্যেই পুলিশ কর্মচারিগণ ঐ যুবতীর দিকে দৌড়াইয়া যায় এবং তাহাকে ধরিয়া ফেলে। ভাইস-চ্যান্সেলার ও মঞ্চস্থিত অন্যান্য সমস্ত লোকই গভর্ণরের দিকে দৌড়াইয়া যান এবং পাঁচ মিনিটের জন্য সভায় একটা বিষম চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল।

ঘটনার পরে

লেডী জ্যাকসন মঞ্চের নিম্নে প্রথম সারিতেই বসিয়া ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া গভর্ণরের নিকট দৌড়াইয়া যান। ইতিমধ্যেই পুলিস ঐ যুবতীকে একটু ধস্তাধস্তির পর গ্রেপ্তার করে।..... '

[আনন্দবাজার : ৭-২-৩২]

হৈ-চৈ পড়ে গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র। বলে কি! শেষে কিনা স্বয়ং গভর্ণর বাহাদুরেব উপর আক্রমণ! এ যে ভয়ঙ্কর কথা!

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁর রয়্যাল টেলিগ্রাম পাঠালেন গভর্ণরের উদ্দেশে।

'I have just heard of the dastardly attempt on your life and am deeply thankful that you have escaped injuri.'

উপাচার্য লেঃ কর্নেল সুরাবর্দীও বাদ গেলেন না। তাঁকে দেওয়া হল 'স্যার' উপাধি—রাজভক্তির নিদর্শন হিসেবে।

জ্যাকসনের তৎপরতায় লক্ষ্যভ্রষ্টা হলেন বীণা দাস। ধরাও পড়লেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তারপরই শুরু হল সেই চিরাচরিত নাটক। কে দিয়েছে তোমাকে এই রিভলবার? কে আছে এর পেছনে? বলতেই হবে।

ঠিকই চিনেছিলেন কমলাদি। বীণার চোখের আগুন মিথ্যে নয়। তাই চুপ করেই তিনি রইলেন সর্বক্ষণ।

পুলিসও সহজ পাত্র নয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা এনে হাজির করল

বীণা দাসের বাবা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাসকে। অর্থাৎ, তিনি একবার বুঝিয়ে বলুন মেয়েকে। বাপের কথায় মেয়ে যদি মুখ খোলে তো ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।

বীণা দাস কি উত্তর দিলেন জান, মল্লিকা?

পুলিস অফিসারকে লক্ষ্য করে হেসে বললেন, শুধু শুধুই কষ্ট করে বাবাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমার বাবা কোনদিন তাঁর মেয়েকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শেখাননি।

ব্যস্ হয়ে গেল। আর একটি কথাও বলতে পারলেন না বেণীমাধববাবু। সন্তানের অন্তহীন বিশ্বাসে তিনি আঘাত করবেন কি করে?

কোন শিক্ষিত বুদ্ধিমান পিতার পক্ষে তা কি সম্ভব?

কথায় বলে ব্রিটিশ আমলের পুলিস। তাই পরদিন সকালেই তারা যথাস্থানে এসে হাজির। উঠুন ম্যাডাম। গাত্রোত্থান করুন। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। সেবার বোমার মামলায় অনেক জ্বালিয়ে ছিলেন আমাদের। এবার যাবেন কোথায়?

আবার সেই ইলিশিয়াম রোড। সেই গোয়েন্দা-দপ্তর। সেই একই অভিনয়। রিভলবারটা তো বীণা দাসকে আপনিই দিয়েছিলেন?

—না। কমলাদি গম্ভীর।

—না বললেই হল! বীণা দাস নিজে বলেছে সে-কথা।

—মিথ্যে কথা। এবার ফুঁসে উঠলেন কমলাদি, বীণাকে আমি চিনি। সে মিথ্যে বলতে অভ্যস্ত নয়।

অভিনয় চলল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। চলল উভয় তরফেই। কখনো বীণা দাসের কাছে, কখনো কমলাদির কাছে।

কিন্তু উত্তর ঐ একটাই। অর্থাৎ, না।

বাধ্য হয়েই কমলাদিকে ছেড়ে দিতে হল তখনকার মত। ভাবটা এই যে,—ঠিক হ্যায়, আভি যাইয়ে। লেকিন যায়েগা কাঁহা?

তক্কে তক্কে রয়েছি। পেলেই হয় একবার মওকামত। তোমার মত ডেঞ্জারাস মেয়েকে আর বেশিদিন বাইরে থাকতে হবে না।

ডেঞ্জারাস মেয়ে!

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। পরাধীন দেশের পুলিসের খাতায় সেদিন এই নামেই চিহ্নিত হয়েছিলেন কমলাদির মত মেয়েরা।

বাংলাদেশের সেই ডেঞ্জারাস মেয়েদের কাহিনী যদি জানতে চাও তো কমলাদির লেখা 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী' বইটি পড়ে দেখো। অনেক ডেঞ্জারাস মেয়ের কাহিনীই তুমি তার মধ্যে পাবে।

পড়ে তারপর একটা প্রশ্ন করো নিজেকে। প্রশ্ন করো যে, পরাধীন দেশের তিন দশকের মেয়েরা সেদিন শিক্ষা, দীক্ষা, ত্যাগে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ইতিহাসে যে নজীর রেখেছিলেন, আজ স্বাধীন দেশের মেয়েদের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও কোথাও দেখা যায় কি?

তবে এজন্য আমি কাউকেই দায়ী করব না, মল্লিকা। দায়ী আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি।

জীবন আজ দুর্বহ। প্রাণধারণের গ্লানি অসহ্য। প্রাত্যহিক এই কঠিন কঠোর, নির্মম জীবনযাত্রার মধ্যে মানুষের ন্যায় নীতি নিষ্ঠা আদর্শ ইত্যাদি সুকোমল বৃত্তিগুলি ব্যর্থ হতে বাধ্য। কোথাও পথ না পেয়ে গড্ডলিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আজ আর কি-ই বা করণীয় আছে মানুষের!

এবার বিচার।

বিচারকের সংখ্যা মোট তিনজন। মিস্টার জাস্টিস সি. সি. ঘোষ, এম. এন. মুখার্জী ও এম. সি. ঘোষ।

সবশেষে বিচারপতি ঘোষ জানতে চাইলেন বীণা দাসের বক্তব্য।

উত্তরে বীণা দাস একটি লিখিত বিবৃতি পাঠ করলেন কোর্টের সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন জাগল সারা ভারতবর্ষে, সারা ইংল্যাণ্ডে। এ তো শুধুমাত্র একটি বিবৃতি নয়, এ যে ক্লাসিক লিটারেচার! ভারতবর্ষের মর্মবাণী!

ফলে, বিধি-নিষেধ। না, এ বিবৃতি ভারতবর্ষের কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা চলবে না। আমাদের নির্দেশমত কিছুটা অংশ প্রকাশ করতে পার, তবে সবটা নয়।

খানিকটা অংশ আমি তোমাকে বাংলা তর্জমা করে শোনাচ্ছি, মল্লিকা ঃ

'আমি স্বীকার করছি যে, সিনেট হাউসে গভর্ণরকে লক্ষ্য করে আমি গুলীবর্ষণ করেছিলাম। আমি নিজেই এজন্য সর্বতোভাবে দায়ী। আমার উদ্দেশ্য ছিল—মৃত্যুবরণ করা। এই স্বেচ্ছাচারী সরকারের বিরুদ্ধে এক মহৎ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করা।

এই সরকার আমার দেশের ত্রিশ কোটি লোককে চিরন্তন দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে এক অপরিসীম লজ্জা ও অন্তহীন বেদনার ভাগী করে রেখেছে। এই সরকারের বিরুদ্ধে আমি এমনভাবে সংগ্রাম করতে চেয়েছিলাম, যা কিছুটা অন্তত সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে। এই অত্যাচারী বিদেশী সরকারের পায়ের নিচে পড়ে শুধু গোঙানো সম্বল করে এই হতভাগ্য ভারতে বেঁচে থাকার সত্যিই কোন সার্থকতা আছে কি? এর চাইতে নিজের জীবনের বিনিময়ে এর বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত প্রতিবাদ জানিয়ে যাওয়াই অনেক ভাল নয় কি? ··

ভারতের একটি মেয়ের আত্মবলিদান এবং ইংল্যাণ্ডের একটি সন্তানের মৃত্যুবরণ, দুই দেশেই এ প্রশ্ন জাগাবে নাকি যে, ভারতের পক্ষে এই চিরন্তন পরাধীনতা মেনে নেওয়া এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এ ব্যাপারে তাদের অন্যায় আচরণ, এ দুই-ই পাপ?

নিজেকে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে, ভগবানের বিচারশালায় একলা দাঁড়িয়ে এই প্রার্থনাই আমি করছি যে, তাঁর অফুরন্ত ক্ষমাশীল ভালবাসা আমাকে ধুয়ে-মুছে সর্বগ্লানিমুক্ত করে যেন এমন নির্মল করে তোলে যে, তাঁর কাছে যথার্থ আত্মনিবেদন করার মত উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারি।...আমার মৃত্যুতেই হোক বা জীবনেই হোক, তাঁর ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয়।'

তারপর? পরের কাহিনী সংবাদপত্র থেকেই শোন :

গভর্ণরকে হত্যা চেষ্টার মামলা

বীণা দাসের ৯ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড

গতকল্য সোমবার কলিকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবিউনালে কুমারী বীণা দাসকে বাঙ্গলার লাটের প্রাণনাশের চেষ্টা সম্পর্কে অভিযুক্ত করা হয়। অভিযোগের উত্তরে আসামী নিজেকে দোষী বলেন। ট্রাইবিউনাল তাঁহাকে নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। গত ৬ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

আদালতে বীণা দাস

'আসামী বীণা দাস জাফরাণী রঙের খদ্দরের শাড়ি পরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে বসিবার জন্য চেয়ার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি শান্তভাবে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।'

[আনন্দবাজার : ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২]

সিনেট হাউসের ঘটনার ঠিক দু-দিন পরেই মেদিনীপুর জেলে অনুষ্ঠিত হল আর এক নাটক। বিপ্লবের ইতিহাসে আর এক নতুন অধ্যায়

দীনেশ ক্ষিপ্ত, চঞ্চল। ভাল লাগে না এই পাঁচিল-ঘেরা বন্দী-জীবন। এ দুঃসহ অবস্থা থেকে রেহাই পেতে হবে। মুক্তি পেতে হবে। অবারিত মুক্তি।

ইতিমধ্যে বীণা দাসের খবরটা পাঁচিল টপকে জেলের অভ্যন্তরে এসে গেছে।

শুনে আরো চঞ্চল হয়ে উঠেছেন দীনেশ। বেশ বোঝা যায় যে, এর পেছনে কমলাদির গোপন হাত রয়ে গেছে।

সাবাস! এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। এমনি করেই আজ একের পর এক সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে দেশের এই মুক্তি-সংগ্রামে। কাউকে পিছিয়ে থাকলে চলবে না।

'যেতে নাহি দিব।'

মানব-মনের এ আবেদন চিরন্তন। আত্মীয়-স্বজন প্রিয়-পরিজন সবারই ঐ একই দাবি—যেতে নাহি দিব।

তাই হোক। তাদের মাঝেই আবার সে ফিরে যাবে এবারের মত যাত্রাবিরতি করে।

হিজলী জেল-পলাতক বিপ্লবী নেতা নলিনী দাস বর্তমানে কলকাতায় রয়েছেন বলে খবর এসেছে। কমলাদি তো বাইরেই রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আবার নতুন করে লাগতে হবে সংগঠনের কাজে।

কিন্তু ঐ পাঁচিলটা! এপারে বন্দিশালা। ওপারে মুক্ত জীবন মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ঐ শক্ত পাঁচিলটা। বেশ উঁচু। অন্তত সাধারণ লোকের পক্ষে তো বটেই।

কিন্তু ডাকসাইটে লাঠিয়াল দীনেশ মজুমদারের পক্ষেও খুব উঁচু বলে মনে হয় কি ? দেখা যাক না !

প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয়েছে কয়েকদিন আগে থেকেই। সকাল-সন্ধ্যায় 'গিন্‌তি মিলানো' বন্দিশালার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। অর্থাৎ, এক এক করে বন্দীদের গুনে দেখা হয় যে, সব ঠিকঠাক আছে কিনা !

সেদিন সন্ধ্যায় দীনেশদের কক্ষে গিন্‌তি মিলাতে গিয়ে ওয়ার্ডার অবাক !

একি ! ঘরের মধ্যে কাপড় টাঙিয়ে আলাদা আলাদা ঘর করা হয়েছে কেন ?

স্বদেশীবাবুরা কি থিয়েটার করবেন নাকি ? কি ব্যাপার ?

—ব্যাপার কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে-কথা বললে তুমি আর তো বিশ্বাস করবে না ওয়ার্ডার সাহেব। তার চাইতে যাও, নিজেই ভেতরে গিয়ে গিন্‌তি মিলিয়ে এসো গে।

—আরে রাম রাম ! ভেতরে পা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার বেরিয়ে এলেন ওয়ার্ডার সাহেব। এই স্বদেশীবাবুগুলো যেন কি ! কাপড়-চোপড় একটু সামলে চলতে হয় তো ! আর চলবেই বা কি করে ? ঘুমের মধ্যে কি কারো জ্ঞানগম্যি থাকে কিছু ? না, ঠিকই করেছে ওরা এমনি আলাদা আলাদা ঘর বানিয়ে। বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে বেশ।

অগত্যা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েই গিন্‌তি মিলাতে শুরু করলেন ওয়ার্ডার সাহেব,—হাই-ই-ই—একনম্বর মাট্টিলাল ভইস্, দোনম্বর ছিরিপতি সরকার, তিননম্বর মাতিঞ্জয় দোস্তিদার, চারনম্বর শচীন করগুপ্ত, পাঁচনম্বর সুশীল দাশগুপ্ত, ছে-নম্বর দীনেশচন্দর মজুমদার—

—হ্যায় বাবা, হ্যায়। সব ঠিক হ্যায়। নিজের চোখে দেখলে তো সব। এবার দরজায় তালা মেরে জলদি ভাগো। বড্ড ঘুম পাচ্ছে !

পরের দিনও তাই। তার পরের দিনও। তারপর রোজই

অবশেষে এল সেই স্মরণীয় ৮ই ফেব্রুয়ারি। সেদিনও তাই। সব ঠিক হ্যায়। সুতরাং বন্ধ হল লৌহকারার লৌহকপাট। আবার সেই কপাট খুলবে কাল সকালে গিন্‌তি মিলানোর সময়।

কিন্তু দীনেশ। দীনেশ কোথায়?

তিনি কি ভেতরেই আছেন?

মোটেই না। সাড়া দিয়েছেন অন্য লোক। সঙ্গী সুশীল দাশগুপ্ত ও শচীন করগুপ্তকে নিয়ে তিনি তখন আশ্রয় নিয়েছেন জেলের ধোপাখানার বিরাট চুল্লীগুলোর অভ্যন্তরে। বেশ জায়গা। বাইরে থেকে হঠাৎ কিছু বোঝা যায় না।

প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল এমনি করেই।

সঙ্গীদের নিয়ে এবার আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়ালেন দীনেশ।

নিঝুম রাত্রি। কেউ নেই কাছে-কিনারে। শুধু মাঝে মাঝে ভেসে আসছে দূরাগত প্রহরীদের ভারি বুটের শব্দ।

এই সুযোগ। একটু বাদেই আবার প্রহরীরা এদিকে রাউণ্ডে আসবে। তার আগেই যা করার করে ফেলতে হবে।

ব্যবস্থা অবশ্য ঠিকই আছে। কাপড় রোদে দেবার জন্য ধোপাদের বড় বড় বাঁশগুলো অনেকদিন থেকেই এখানে পড়ে আছে জানলার দুটো গরাদেও বাঁকিয়ে হুকের মত তৈরি করে রাখা হয়েছে

এবার বাঁশের মাথায় হুক দুটোকে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে পাঁচিলের ওপর ঝুলিয়ে দিলেই, ব্যস্!

আরো কিছু করণীয় কাজ আছে। ঠিক এমনিভাবেই আর একটা বাঁশকে পাঁচিলের ওপাশে ঝুলিয়ে দিতে হবে নিচে নেমে যাবার জন্য।

প্রথমেই উঠে গেলেন দীনেশ। পাঁচিলের ওপর মজবুত হয়ে উঠে বসে এবার তিনি সঙ্গীদের তুলে নিয়ে ওপারে নামিয়ে দিলেন এক এক করে। এবার তাঁর নিজের নেমে যাবার পালা।

কিন্তু না, বাঁশদুটো এভাবে এখানে রেখে যাওয়া উচিত হবে না। একটু বাদেই রাউণ্ডে আসবে প্রহরীর দল। নজরে পড়লে বিপদ হতে কতক্ষণ!

হয়তো জোর তল্লাশী শুরু হয়ে যাবে চারিদিকে। তাতে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং এ দুটোকে সরিয়ে ফেলা দরকার।

কিন্তু পাঁচিলটা বড্ড উঁচু। কি করা যায় এখন?

নিজের ওপর এবার মস্তবড় একটা ঝুঁকি নিলেন দীনেশ। বাঁশ-দুটোকে দূরে ফেলে দিয়ে হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন পাঁচিলের ওপর। তারপরই উন্মত্ত আবেগে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লেন শক্ত মাটির ওপর।

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি!

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন দীনেশ। অবারিত মুক্তি! এবার ছুট-ছুট-ছুট!

পায়ে বেশ লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। তা হোক। ওসব ভাববার সময় এখন নয়। এক্ষুণি ওদের নাগালের বাইরে চলে যেতে হবে। চলে যেতে হবে দূরে। অনেক দূরে।

পরদিন সকালে গিনতি মেলাতে গিয়ে ওয়ার্ডার অবাক। সঙ্গে সঙ্গে পাগলা-ঘন্টি বেজে উঠল—ঢং-ঢং-ঢং-ঢং!

নিমেষে লাঠি-সোঁটা-বন্দুক নিয়ে বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল বীর প্রহরীর দল। আসামী ভাগ গিয়া। জলদি পাকড়ো।

কিন্তু কোথায় আসামী! ততক্ষণে তাঁরা নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছেন কলকাতায়।

রব উঠল দেশের সর্বত্র। সাবাস! সাবাস! দেখালে বটে পরাধীন দেশের ছেলে! আরে বাবা, ওর মত লাঠিয়ালকে আটকে রাখা কি চাট্টিখানি কথা! হাতে একগাছা লাঠি থাকলে ও যে একাই একশো!

খবর শুনে কমলাদি আত্মহারা। বুকের মধ্যে যেন কতকালের, কতযুগের একটা বিস্মৃতপ্রায় উৎসের মুখ খুলে গেছে।

দীনেশবাবু ফিরে এসেছেন!

আশ্চর্য, কি করে এটা সম্ভব হল! এ যে অভাবনীয়! অকল্পনীয়! চিন্তাও যেন করা যায় না।

আর ভাবনা নেই। হিজলী জেল-পলাতক বিপ্লবী নেতা নলিনী দাস আগেই এসে গেছেন। এসে গেছেন দীনেশবাবুও। এবার নতুন উদ্যমে কাজে লাগতে হবে। নতুন করে সংগঠন করতে হবে।

কবে দীনেশবাবুর সঙ্গে দেখা হবে? কবে?

একই কথা উত্তাল হয়ে উঠল আরো একজনের মনে।

অতুল সেন। দীনেশের সেই সহকারী অতুল সেন।

দীনেশবাবু এসে গেছেন। এবার সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। ডু অর ডাই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। মারব, নয় তো মরব। শুধু একটা সুযোগ চাই। একটা সুযোগ।

বেশিদিন আর অপেক্ষা করতে হল না কমলাদিকে।

সেদিন স্কুলের কাজ যথারীতি চলছে। হঠাৎ দূত এসে হাজির। গাড়ি প্রস্তুত। এক্ষুণি যেতে হবে। দীনেশবাবু ডেকেছেন।

দীনেশবাবু ডেকেছেন! আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন কমলাদি। বুকের মধ্যে যেন অনেকগুলো মরচে-পড়া তার একসঙ্গে বেজে উঠল কোন এক বিগত বাঁধা সুরে।

সহপাঠী, বন্ধু ও গুরু দীনেশবাবুর সঙ্গে যে এমনি অপ্রত্যাশিত-ভাবে দেখা হয়ে যাবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল! নিজেই কি তিনি ভাবতে পেরেছিলেন কোনদিন!

দেখা হল দমদমে। দীনেশই সর্বপ্রথম আহ্বান জানালেন,—'আসুন কমলাদি!'

কমলাদি অভিভূত, বিহ্বল। সেই নিবিড় মায়াজড়ানো অন্তরঙ্গ কণ্ঠস্বর। আজও তেমনি সুরেলা। তেমনি মধুময়। দেহের তন্ত্রী-গুলো কি এক অপরূপ রসস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। সাড়া দেবার ভাষা নেই।

প্রথমেই উঠল বীণা দাসের প্রসঙ্গ।

দীনেশের সারামুখে রহস্যময় হাসি। এ-ব্যাপারের নেপথ্য-নায়িকাটিকে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। নিশ্চয় কমলাদি। কমলাদি ছাড়া তিনি আর কেউ নন।

মনটা আকুলি-বিকুলি করতে লাগল কমলাদির। কথাটা গলার কাছ অবধি এসেও ফিরে গেল বার কয়েক। হয়তো এ-সুযোগ আর কখনো মিলবে না এ-জীবনে। এমন নিভৃত অবসর।

তবু কিছুই তিনি বলতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত। সৈনিককে নিজে থেকে কিছু বলতে নেই। বলা উচিত নয়।

অবস্থাটা অনুমান করতে পেরে হা-হা করে হেসে উঠলেন দীনেশ। হাসলেন কমলাদিও। সেই ভুলে-যাওয়া হাসি।

কেটে গেল কয়েকটি মুহূর্ত। দুজনের মনেই তখন বয়ে চলেছে অসংখ্য প্রশ্ন। অসংখ্য কথার ভিড়। কথা বলার চাইতে না-বলার মধ্য দিয়েই বুঝি অনেক কথার বিনিময় হয়ে গেল সেই কয়েকটি সামান্য মুহূর্তের অবকাশে।

যথাসময়ে ফিরে এলেন কমলাদি। মনে বেজে চলেছে তখন এক নতুন সুর। সময় নেই। সময় নেই। আবার দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আবার শুরু হবে রক্ত দেবার পালা।

এ বিষয়ে কবে দীনেশবাবুর কাছ থেকে চরম নির্দেশ পাওয়া যাবে? কবে আবার দেখা হবে তাঁর সঙ্গে? কবে?

দেখা কিন্তু আর হল না, মল্লিকা। এতদিন ফাঁকি দিয়ে এলেও এবার আর তিনি পারলেন না পুলিসের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে। তাই দুদিন যেতে না যেতেই আবার তাঁর ডাক পড়ল শাসকদের দরবারে। সেখান থেকে সোজা বন্দী-নিবাস। সেখানে একটানা ছ' বছর।

ওদিকে শান্তি ও বিশ্রামের আশাকে পেছনে ফেলে রেখে সঙ্গে সঙ্গেই আবার দীনেশ ঝাঁপিয়ে পড়লেন অশান্ত কর্মজীবনের মধ্যে। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। এবার এক এক করে সব শেষ করতে হবে।

শুভার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যরকম বোঝালেন। দীনেশের পক্ষে এখন কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। অন্য কোন দেশে তাঁর চলে যাওয়া উচিত।

জাপানে অবস্থানরত বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি সানন্দে রাজি হয়েছেন দীনেশকে আশ্রয় দিতে। সুতরাং আত্মরক্ষা করতে হলে অবিলম্বে তাঁর জাপানে চলে যাওয়া কর্তব্য।

দীনেশ রাজি নন। আগে কাজ, তারপর অন্য কথা। তার জন্য যদি প্রাণ যায় তো যাক। তবু কাজ ফেলে দেশের বাইরে যেতে তিনি প্রস্তুত নন।

প্রথম কাজ শ্বেতাঙ্গ সরকারের মুখপত্র স্টেটস্‌ম্যান-সম্পাদক মিঃ ওয়াটসনকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া।

কি স্পর্ধা লোকটার! কাগজের প্রতিটি সংখ্যায় সে বিপ্লবীদের প্রতি আরো কঠোর, আরো হিংস্র হবার জন্য সরকারকে সমানে উৎসাহ দিয়ে চলেছে। কতরকম জঘন্য উক্তি:

'No track with the terrorists. Give the dog a bad name to hang him. If another European was murdered, detenus should be shot.'

অর্থাৎ,—কোন দয়া নয়, কোন খাতির নয়, বিপ্লবী বলে যাকে সন্দেহ হবে, তাকেই হত্যা কর। কোন শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করা হলে তার বদলা হিসাবে রাজবন্দীদের গুলী করে মারো।

শুধু ওয়াটসন নয়, ইউরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সের বক্তব্যও তাই। তারও সেই একই উপদেশ। সরকারের উচিত, বিপ্লবী বলে যাকে সন্দেহ হবে, তাকেই দেওয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলী করে হত্যা করা। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

বলা বাহুল্য যে, ভিলিয়ার্সকে আর বেশিদিন উপদেশ দিতে হয়নি। ক-দিন বাদেই তাকে ধূলিশয্যা নিতে হয়েছিল বি. ভি.-র দুরন্ত বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের অব্যর্থ গুলীতে। উল্লেখযোগ্য যে, এই বিমল দাশগুপ্তই একদিন মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট পেডিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে। সঙ্গে ছিলেন আরো একজন বিপ্লবী তরুণ যতিজীবন ঘোষ।

ভিলিয়ার্সের পরে ওয়াটসন। কিছুতেই ওকে ছাড়া হবে না। কে নেবে এই দায়িত্বভার!

এমন সুযোগ অতুল সেন ছাড়েন কখনো! কথা তাঁর একটাই। ডু আর ডাই। মারব, নয়তো মরব।

১৯৩২ সাল, ৫ই আগস্ট। অফিসের দরজায় ওয়াটসনকে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন অতুল সেন। তারপরই তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম!

না, হল না। অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে নিজেকে সরিয়ে নিল ওয়াটসন। আবার ট্রিগার টানতে হবে।

না, তাও হল না। তার আগেই ছুটে এল তৎপর প্রহরীর দল। রেহাই পাবার কোন আশাই নেই।

ডু অর ডাই। হয় মারব, নয় মরব। প্রতিজ্ঞায় অটুট রইলেন অতুল সেন। তাই মুখে পুরে দিলেন সায়ানাইডের পুরিয়া। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সৈনিক তিনি। কথার খেলাপ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ তুলে দিচ্ছি :

স্টেটস্ম্যান সম্পাদকের উপর রিভলবারের গুলী

'গতকল্য শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩টার সময় স্টেটস্ম্যান পত্রিকার সম্পাদক স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন যখন জলযোগ করিয়া মোটরযোগে তাঁহার কার্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন স্টেটস্ম্যান অফিসের সম্মুখে চৌরঙ্গীর উপর জনৈক বাঙ্গালী যুবক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া রিভলবার হইতে গুলী করে।...

প্রকাশ যে, অল্পের জন্য স্যার আলফ্রেড ওয়াটসনের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।...নিকটেই একটি পুলিস কনেস্টবল উপস্থিত ছিল। সে এবং স্টেটস্ম্যান অফিসের দরোয়ান আসিয়া আততায়ীকে ধরিয়া ফেলে।

আততায়ী যুবক কোনপ্রকারে পকেটে হাত দিয়া কোন জিনিস বাহির করে এবং তাড়াতাড়ি মুখে পুরিয়া দেয়। সম্ভবত এই জিনিস পটাসিয়াম সায়ানাইড নামক বিষ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, ইহা মুখে দেওয়ার পরই সে অজ্ঞান হইয়া ধরাশায়ী হয়।

তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছিল; কিন্তু পথিমধ্যেই সে মারা যায়।

আততায়ীর বয়স আন্দাজ ২১ বৎসর হইবে।...

আততায়ীর নাম

পরে জানা গেল, স্যার আলফ্রেড ওয়াটসনের উপর গুলী করিয়া যে যুবক আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার নাম অতুল সেন। সে খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামের অধিবাসী। সে নাকি পূর্বে যাদবপুর টেকনিক্যাল কলেজে পড়িত।' [আনন্দবাজার : ৬-৮-৩২]

মন উঠল না দলীয় সদস্যদের। ওয়াটসন বেঁচে গেল, তার জন্য হারাতে হল কিনা অতুল সেনের মত ছেলেকে! অসম্ভব! কিছুতেই ছাড়া হবে না ওয়াটসনকে। রক্তের ঋণ রক্ত দিয়েই ওকে শোধ করতে হবে।

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। সুযোগ পাওয়া গেল ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে।

এবার আরো ব্যাপকভাবে। কিন্তু বিনিময়ে মূল্য দিতে হল প্রচুর। ওয়াটসন জখম হলেও এ পক্ষে হারাতে হল অনিল ভাদুড়ী ও মনি লাহিড়ী নামে দুজন বিপ্লবী তরুণকে। সংবাদপত্র থেকেই সে-কাহিনী তুমি শোন :

স্টেটস্‌ম্যান সম্পাদকের উপর আবার গুলী

'গতকল্য স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক স্যার আলফ্রেড ওয়াটসনের প্রাণনাশের আর এক চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা ৭টার সময়

তিনজন বাঙ্গালী যুবক একটি বাড়ির মোটর গাড়ি করিয়া ময়দানে হেস্টিংসের নিকট ক্লাইভ রোডে স্যার আলফ্রেডের গাড়ি পিছন হইতে ধরিয়া ফেলে এবং তাঁহার প্রতি দশটি গুলী ছোঁড়ে।···

গুলীর আঘাতে স্যার আলফ্রেড এবং তাঁর সেক্রেটারী মিসেস গ্রোস আহত হন।···স্যার আলফ্রেডের উভয় স্কন্ধেই গুলী লাগে এবং তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁহার অবস্থা বেশ ভালোর দিকেই যাইতেছে।

তিনজন আততায়ীর মধ্যে দুইজনকে পরে বেহালার দক্ষিণে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহারা বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।'··· [আনন্দবাজার : ২৯-৯-৩২]

আর একমুহূর্তও দেরি করল না ওয়াটসন। কোনরকমে সুস্থ হয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গেই সোজা বিলেত। আর কাজ নেই বাবা, যথেষ্ট হয়েছে। এবার মানে মানে সরে যাওয়াই ভাল।

এবার বিচার। বিচারে সুনীল চ্যাটার্জীকে দেওয়া হল দীর্ঘ-মেয়াদী কারাদণ্ড।

রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল আহত ব্রিটিশসিংহ। শুরু হল তার তর্জন-গর্জন।

এই সেদিন হিজলী জেল থেকে নলিনী দাস পালিয়ে গেল। আবার ওদিকে সঙ্গীদের নিয়ে দীনেশ মজুমদারও হাওয়া। এতবড় পরাজয় মহামান্য সরকার বাহাদুর সহ্য করবেন কি করে! সুতরাং, জীবিত হোক, বা মৃত হোক, দীনেশ মজুমদারের শির চাই। চাই-ই!

খবরটা দীনেশের অজানা রইল না। তাই বাধ্য হয়েই তিনি এবার গা-ঢাকা দিলেন কিছুদিনের জন্য।

এদিকে গোটা পুলিস-বিভাগ তখন দিশেহারা। গেল কোথায় লোকটা? সম্ভাব্য প্রতিটি জায়গা খুঁজে দেখা হয়েছে। তন্ন-তন্ন করে প্রতিটি সন্দেহজনক স্থানে তল্লাশী চালানো হয়েছে, তবু তার কোন খবর নেই। ওপরওয়ালার কাছে মুখ দেখানোও যে দায়!

খবর পাওয়া গেল চুঁচড়াতে।

হঠাৎ কি দেখে সেদিন ওখানকার পুলিস অবাক।

আরে! কে যাচ্ছে সাইকেলে করে! মেদিনীপুর জেল থেকে পলাতক শচীন করগুপ্ত আর দীনেশ মজুমদার না! সঙ্গে রয়েছে আরো একজন। পাকড়ো! পাকড়ো! ডাকু হ্যায়! একনম্বর ডাকু!

ধরা পড়লেন শচীন করগুপ্ত। কিন্তু দীনেশ! দীনেশ কোথায়?

আশ্চর্য, কোথাও নেই। এত তৎপরতা সত্ত্বেও ঠিক তিনি বাইরে চলে গেছেন পুলিসের বেড়াজাল টপকে।

পরদিনই সে খবর প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়:

দীনেশ মজুমদার, জিতেন গুপ্ত

'গত শনিবার চুঁচড়ার নিকট গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে দুইজন যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজনকে শচীন করগুপ্ত বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেল, হিজলী বন্দিশালা ও বক্সা বন্দিশালা হইতে যে সমস্ত আসামী পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ৩ জন ব্যতীত অন্যান্য সকলেই পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই তিনজনের নাম—জিতেন গুপ্ত (বক্সা বন্দিশালা হইতে পলাতক), দীনেশ মজুমদার (মেদিনীপুর জেল হইতে পলাতক), নলিনী দাস (হিজলী বন্দিশালা হইতে পলাতক)।

দীনেশ মজুমদারের গ্রেপ্তারের জন্য ১৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। জিতেন গুপ্ত ও নলিনী দাস,—প্রত্যেকের গ্রেপ্তারের জন্য ১০০০ টাকা করিয়া পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।'...

[আনন্দবাজার : ২২-১২-৩২]

শুরু হল দীনেশের পথ-পরিক্রমা।

সহায়হীন, সম্পদহীনভাবে কুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনির্দেশ যাত্রা।

শ্যাওলার মত এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে। আজ বাঁকুড়া, কাল পুরুলিয়া, পরশু ঝরিয়া, তারপর দিন কোথায় কে জানে!

শুধু পথ আর পথ। কিন্তু এ আর কতটুকু পথ! এখনো অন্তহীন পথ তাঁকে পার হতে হবে। যার আদি আছে, শেষ নেই।

বাঁকে বাঁকে ওৎ পেতে আছে সর্বনাশ আর ধ্বংস। জীবন আর মৃত্যু দুই-ই এখন সজীব। বাঁচতে হলে এখন যুঝতে হবে প্রতি মুহূর্তে।

অবশ্য মরণকে তিনি ভয় পান না। মরণ তো বৈশাখী ঝড়। কখন কোন্‌দিক থেকে উড়ে আসবে কেউ বলতে পারে না।

তা বলে ভীরুর মত মরতে তিনি রাজি নন। মরতেই যদি হয় তো সৈনিকের মত লড়াই করেই মরবেন।

জীবনের নির্মম ঢেউয়ে একদিক থেকে আর একদিকে।

ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে রাণীগঞ্জ। মলিন জীর্ণ পোশাক। সারা-দেহে করুণ দারিদ্র্য। মুখে-চোখে ক্ষুধার স্বাক্ষর। ক্লান্ত পা যেন চলতেই চায় না।

দীনেশ নির্বিকার। কোন দুঃখ নেই। কোন ক্ষোভ নেই।

এ-পথ অনিশ্চিতের পথ। এ-পথে যে এসেছে তারই সর্বাঙ্গে বয়ে গেছে রক্তের বসুধারা। সুতরাং এ তো তার প্রাপ্য। তার জন্য দুঃখ কিসের?

কিন্তু ক্ষুধা! অসহ্য ক্ষুধা! নিজেকে শক্ত রাখতে হলে ক্ষুধার উপকরণ চাই যে!

অবশ্য অর্থের জন্য ভাবনা নেই। পুলিসের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে এখনো যে সমস্ত সহকর্মীর দল এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন, তাঁদের খবর দিলে সঙ্গে সঙ্গে অর্থের সুরাহা হয়ে যাবে।

কিন্তু না। সর্বত্র পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি। এ সময়ে কাউকে নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়ানোটা ঠিক হবে না। কখন কি ঘটে যাবে কে বলতে পারে!

কি করা যায় এখন! সামনেই একটা কোলিয়ারী। দেখবে নাকি একবার ওখানে গিয়ে! চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি!

দেখে খুশিই হলেন কোলিয়ারীর হাজিরাবাবু। জোয়ান মরদ ছেলে। মজুরের কাজটা ভালই পারবে বলে মনে হয়।

তবে দৈনিক মজুরী তিন আনা থেকে তাঁর কমিশন বাবদ দুটো করে পয়সা কিন্তু নগদ দিয়ে দিতে হবে। ওখানে বাকি-টাকি চলবে না।

রাজি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে খাদে নেমে গেলেন দীনেশ।

দেখতে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র দীনেশ মজুমদারের খোলশ ত্যাগ করে বেরিয়ে এল এক সাঁওতাল দিনমজুর,—টিন্কু মাঝি। ভরা জোয়ান ছেলে। স্বাস্থ্য দেখলে সাঁওতাল বলেই ভুল হয়।

কেটে গেল কয়েকদিন।

দীনেশ বিব্রত। দ্বিধা ও কুণ্ঠায় জড়সড়। সভ্যজগৎ থেকে অনেক দূরে এ যেন এক আলাদা পৃথিবী। এরা যেন সব আলাদা মানুষ। এদের কথা আলাদা। সব কিছু আলাদা। কোনদিক থেকেই এতটুকু মিল নেই তার সঙ্গে।

সবচাইতে দুঃসহ মনে হয় অল্পবয়েসী কয়েকটা মেয়ে-মজুরকে। সর্বক্ষণই কেমন যেন ওদের গায়ে-পড়া ভাব।

জোয়ান মরদ হয়েও কেন টিন্কু মাঝি নেশা করে না, কেন সামান্য বিড়িটা পর্যন্ত খায় না, এ যেন ওদের কাছে মস্তবড় একটা বিস্ময়।

আর সে কি কুৎসিত ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি! মনে হলেও গা যেন ঘিন ঘিন করে ওঠে।

এখানে এসে তাঁর প্রাত্যহিক অভাবটা মিটেছে বটে, কিন্তু এই কি জীবন! এ জীবন নিয়ে বাঁচতে পারে কেউ!

কিন্তু উপায় কি! মানিয়ে যে নিতেই হবে।

শুরু হল কানাঘুষা। প্রথমে চাপাগুঞ্জন, পরে আর চাপা রইল না। সবার মুখে একই কথা। কে এই টিন্কু মাঝি?

উঁহু, ও তো সাঁওতাল নয়। সাঁওতাল মজুরদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তো ওর এতটুকুও মিল নেই। নিশ্চয় ও কোন খুনে ডাকাত। বোধহয় পুলিসের ভয়ে সাঁওতালের আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে।

আভাসে সবকিছু টের পেয়ে রাত্রির অন্ধকারে আবার তরী ভাসালেন দীনেশ। রাত্রির তমসা ভেদ করে কোথায় কোন্ কূলে গিয়ে তাঁর এই তরী গিয়ে ভিড়বে কে জানে!

অবশেষে চন্দননগর। প্রথমে ডাঃ হীরেন্দ্র চ্যাটার্জীর গৃহে, পরে দাশরথী ঘোষের বাড়িতে। সঙ্গে সেই হিজলী বন্দী-নিবাস থেকে পলাতক নলিনী দাস এবং ওয়াটসন-হত্যা প্রচেষ্টার পলাতক আসামী বীরেন্দ্র রায়।

চুপ করে থাকার ছেলে দীনেশ নন। তাই এখান থেকেই আবার তিনি যোগাযোগ করলেন পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে। কল্যাণীদির চিঠি থেকেই সে কাহিনী তুমি শোন:

'সবেমাত্র আট মাস জেল খেটে ফিরছি। হঠাৎ একদিন শুনলাম দীনেশবাবু নাকি মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়েছেন। কোথায় আছেন তার কোন সন্ধান নেই।

সন্ধান পেলাম আরো কিছুদিন বাদে। তিনি তখন চন্দননগরে। সঙ্গে রয়েছেন আরো দুজন পলাতক বিপ্লবী। নলিনী দাস এবং বীরেন্দ্র রায়।

সুলতা আর আমি অনেকদিন ওখানে গিয়েছি হাতে শাঁখা পরে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে কনে বউ সেজে। শ্যামনগর গিয়ে ওখান থেকে নৌকো করে ওপারে যেতাম। কোন কোনদিন ফেরা সম্ভব হত না। ফিরে আসতাম পরদিন ভোরে। বাবা জিজ্ঞেস করলে বলতাম,—দূরের একটা স্কুলে প্রাইজ দিতে গিয়েছিলাম।'

ওদিকে তখন ব্যর্থতার জ্বালায় মরিয়া হয়ে উঠেছে শাসক-সম্প্রদায়। দীনেশ মজুমদার কোথায়! শুধু বাংলাদেশ নয়, অন্যান্য রাজ্যগুলোকেও একটু চোখ-কান খোলা রাখতে বলো ওর সম্বন্ধে। গুপ্তচর বাহিনীকে আরো তৎপর হতে বলো। বলো যে, ধরিয়ে দিতে পারলে অনেক টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে করে হোক, ওকে গ্রেপ্তার করা চাই-ই!

'মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার
সময় তো নাই শুধাবার।'

জি. টি. রোড ধরে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে ছুটে চলেছে কয়েকটা পুলিস-ভ্যান।

চন্দননগরে ব্রিটিশ ভারতের তিনজন পলাতক বিপ্লবী আত্মগোপন করে রয়েছে বলে গুপ্তচর মারফত খবর পাওয়া গেছে। তাই ফরাসী পুলিস কমিশনার মঁসিয়ে কুঁই সদলবলে চলেছে তাদের গ্রেপ্তার করতে। উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ সরকারের হাতে তাদের তুলে দেওয়া।

কিন্তু কেন? চন্দননগর তো ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত নয়! তাহলে কেন তাদের এই অহেতুক কর্তব্যপরায়ণতা?

কারণ সেই একই। সাম্রাজ্যবাদীদের চেহারা সর্বত্রই এক সর্বত্রই সমান। স্বার্থের ব্যাপারে এরা কেউ কারো চাইতে আলাদা নয়।

প্রমাণ, বীর সাভারকার। ইংরেজের জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার দিয়ে ফ্রান্সের উপকূলে পৌঁছে তিনি একদিন ফরাসী সরকারের আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। আশ্রয় দেওয়া তো দূরের কথা, উল্টে আরো ফরাসী সরকার তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের হাতে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে তাঁদের উভয়ের স্বার্থই এক ও অভিন্ন।

প্রমাণ, পুঁটুদি। টেগার্ট নিজেই সেদিন চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁকেও গ্রেপ্তার করেছিলেন এই চন্দননগরে হানা দিয়ে। সৌজন্য হিসেবে ফরাসী সরকারের কোন অনুমতি পর্যন্ত নেয়নি। প্রয়োজনও বোধ করেনি।

আশ্চর্য, এতটুকুও বাধা দেননি ফরাসী সরকার। সামান্য প্রতিবাদও করেননি। বরং নিঃশব্দেই সেদিন তাঁরা হজম করেছিলেন এই জাতীয় অপমানটাকে। কারণ, সেই স্বার্থ। সেখানে সবাই তাঁরা 'মাসতুতো ভাই।'

আরো প্রমাণ, জাপান সরকার। তাঁরাও একদিন ইংরেজের হাতে তুলে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে।

পারেননি শুধু শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্ল্যাক ড্রাগনের জন্য। সেদিন ঐ ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টি রুখে না দাঁড়ালে শেষ পর্যন্ত তাঁর অদৃষ্টে যে কি দাঁড়াত, তা বলাই বাহুল্য।

সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে আজ ১৯৩৩ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে চন্দননগরে।

মঁসিয়ে কুঁই স্থিরপ্রতিজ্ঞ। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বাহব

নেবার এতবড় সুযোগটা সে কোনমতেই হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

কিন্তু পারবে কি তুমি মঁসিয়ে কুঁই? প্রবল প্রতাপশালী ইংরেজ সরকার পুরো একবছর ধরে হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যাঁদের নাগাল পায়নি, পারবে কি তুমি তাঁদের দিকে হাত বাড়াতে?

বেশ, দেখ চেষ্টা করে! তবে সাবধান মঁসিয়ে কুঁই! আগুনে হাত দিলে অনেক সময় নিজেরও হাত পোড়ে, তা যেন ভুলে যেয়ো না।

ওদিকে তখন জোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে দীনেশ ও নলিনী দাসের মধ্যে। কার কব্জিতে কত জোর পরীক্ষা হোক। ধরো পাঞ্জা।

দীনেশ নামকরা লাঠিয়াল। নলিনী দাসও বরিশালের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড়। সুতরাং, কেউ কারো কাছে এত সহজে হার মানতে রাজি নন।

হঠাৎ দীনেশ কি দেখে চমকে উঠলেন দারুণভাবে। বেড়ালের মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কারা যেন দলবেঁধে এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। ওরা কারা! হাতে ওদের কি ওগুলো!

রাইফেল! রাইফেল! রাইফেল! রেডি! কুইক! গেট আপ! কার কব্জিতে কত জোর, এবার আসল জায়গায় তা পরীক্ষা হয়ে যাক!

ঝড়ের মত বেরিয়ে পড়লেন তিনজন। তারপরই শুরু হল কানামাছি খেলা।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একসময়ে বৈকুণ্ঠ নন্দীর বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে পরক্ষণেই আবার তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন অন্য একটা দরজা দিয়ে।

হায় ভগবান! একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই মঁসিয়ে কুঁই।

ছুট! ছুট! ছুট! আরো জোরে। আরো!

এমনি করে পঞ্চাননতলা। কিন্তু একি! কোথা থেকে একটা

সাইকেল সংগ্রহ করে তীরের মত ছুটে আসছে মঁসিয়ে কুঁই। আর দেরি নেই। এসে পড়েছে।

নিমেষে ঘুরে দাঁড়ালেন দীনেশ। শোন কুঁই। আমরা চোর-ডাকাত নই, বিপ্লবী। ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই। তাহলে কেন তুমি বাধা দিচ্ছ এমন করে? সরে দাঁড়াও।

চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী, তাই কোনরকম কর্ণপাত না করে নিমেষে রুখে দাঁড়াল মঁসিয়ে কুঁই। সঙ্গে সঙ্গে কে একজন দীনেশের পা জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

—হ্যাণ্ডস্ আপ! উদ্যত পিস্তল নিয়ে বীরদর্পে এবার কাছে এগিয়ে এল মঁসিয়ে কুঁই।

লক্ষ্মীছেলের মতই হাত তুললেন দীনেশ, তারপরই শোনা গেল পর পর দুটো শব্দ,—দ্রাম! দ্রাম!

ব্যস্, শেষ। কুঁইকে আর চোখ মেলে তাকাতে হল না এ জীবনে।

শুরু হল হৈ-চৈ, চিৎকার আর চেঁচামেচি। ডাকু মার ডালা! ধর-ধর-ধর—ঐ যে পালাচ্ছে!

ছুট! ছুট! ছুট! আবার একটা বাধা পড়ল নাড়ুয়ার দিকে। পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে এক ফরাসী পুলিস। কোনমতেই সে পথ ছাড়তে রাজি নয়।

দ্রাম! দ্রাম! ব্যস্, লাইন ক্লিয়ার। এবার জোরসে ছুট!

হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন নলিনী দাস। ছুটতে ছুটতে এক সময়ে তিনি গিয়ে ছিটকে পড়লেন চুঁচড়ার দিকে।

ছিটকে পড়লেন বীরেন্দ্র রায়ও, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়লেন একটা জঙ্গলের মধ্যে।

দীনেশ গেলেন গঙ্গার দিকে। হাতে তাঁর উদ্যত রিভলবার।

পেছনে ছুটছে হিংস্র শিকারীর দল। ধর—ধর! ঐ যে গঙ্গার দিকে যাচ্ছে। পাকড়ো! আসামী ভাগ্‌তা হ্যায়!

সামনেই গঙ্গা। জলে থৈ-থৈ করছে চারিদিক।

কিন্তু কোথায় আসামী! আশ্চর্য, কেউ কোথাও নেই। চারিদিক একেবারে ফাঁকা।

শুধু এক জায়গায় জনকয়েক শিষ্য-সাগরেদ নিয়ে জনৈক জটাধারী সাধু দিব্যি গঞ্জিকা-সেবনে মত্ত। তাছাড়া আর কেউ নেই।

ফরাসী পুলিস অবাক। একি তাজ্জব কাণ্ড! একটু আগে এদিকেই তো আসতে দেখা গেছে লোকটাকে! তাহলে গেল কোথায়?

এখন উপায়! এতবড় কাণ্ডের পরে আসামী হাতছাড়া হয়ে গেলে চাকরি রাখাই যে দায় হবে!

আসামী কিন্তু জলজ্যান্ত চোখের সামনেই বসে আছে, মল্লিকা।

দেখবে নাকি! বেশ, দেখাচ্ছি। আচ্ছা, বাবাজীর ঐ কৌপীন পরা নতুন চেলাটির দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ দেখি। ঐ যে বড় কল্কে হাতে নিয়ে দিব্যি গোবেচারার মত বসে আছেন— তিনিই।

কিন্তু একি! আরে বাস্ রে বাস্! কি কড়া টান! কল্কে ফেটে না গেলে হয়!

গভীর রাত্রে আবার পায়ে পায়ে ফিরে এলেন দীনেশ।

না, দাশরথী ঘোষের আস্তানায় নয়। প্রথম যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই ডাঃ হীরেন্দ্র চ্যাটার্জীর বাড়ি।

হীরেন্দ্রবাবুর সাহায্যে তুদিন চন্দননগরের এখানে-ওখানে কাটিয়ে তারপরই একদিন তিনি রাত্রির অন্ধকারে পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলেন বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর উত্তরপাড়ার বাড়িতে। সেখানে একদিন কাটিয়ে তারপরই সোজা কলকাতা।

আশ্রয় নিলেন একটা ঘোড়ার আস্তাবলে।

আস্তাবলে ঘোড়া থাকলেও সহিস নেই। ঘোড়াকে দানাপানি দিয়ে কোথায় সে চলে গেছে কে জানে! সুতরাং আপাতত নিশ্চিন্ত।

খাবার জন্য ভাবনা নেই। ঘোড়ার দানাপানি থেকে কিছুটা খেয়ে নিলেই চলবে।

আর ঘুম! ঘুম সম্বন্ধে তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। গাড়িটা অকেজো হলেও তার ভেতরের গদীগুলো ঠিকই আছে। সুতরাং তোফা বন্দোবস্ত।

এমনি করে তিনদিন। দানাপানি দেবার জন্য সহিস যখন আসে, দীনেশ তখন গাড়ির অভ্যন্তরে। আবার চলে গেলেই অমনি বেরিয়ে আসেন গুটি-গুটি পায়ে।

কিন্তু এভাবে আর নয়। চন্দননগরের ঘটনায় পুলিস মহলে আলোড়ন উঠেছে। এ অবস্থায় এত কাছাকাছি এই আস্তাবলে থাকাটা কোনদিক থেকেই নিরাপদ নয়। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে আবার একদিন তিনি পা বাড়ালেন রুক্ষ, কঠিন, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে। কোথায় এই পথের শেষ কে জানে!

নিয়তি যেন দীনেশকে নিয়ে এবার এক উন্মত্ত উল্লাসে মেতে উঠল, মল্লিকা। কূলের সন্ধানে কত ঘাটেই না তাঁর তরী গিয়ে ভিড়ল, কিন্তু কোথায় কূল! চারিদিকে অথৈ জল। কোথাও কূল নেই।

তবু এগিয়ে চলার বিরাম নেই। সামনে তাঁর দীর্ঘ বিসর্পিত পথ। এই পথই আজ তাঁর কাছে একমাত্র সত্য।

কিন্তু কত দূর পথ! দিন মাস কেটে যায়, তবু পথ যেন আর ফুরাতেই চায় না।

দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ফলে দেহেও ইতিমধ্যে ভাঙন ধরেছে। ধীর মন্থর গতি। প্রতিটি কথা, উচ্চারণের ভঙ্গী, চোখের দৃষ্টি, সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা উদাসীন, বীতস্পৃহ ভাব।

এ যেন সেই প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর দীনেশ নন। মনে হয়, তাঁর সমৃদ্ধ ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

তদুপরি কাশি। সেদিন গঙ্গার ঘাটে গঞ্জিকাসেবীর অভিনয়

করার ফল বেশ হাতে হাতেই ফলেছে। মাঝে মাঝেই এখন বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে অদম্য কাশির বেগ। একটার পর একটা। অসংখ্য।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নিঃসঙ্গ প্রহরে প্রায়ই মনে পড়ে পুরনো দিনের কথা। কোথায় আজ সেই সহকর্মীর দল ?

কোথায় গেলেন রসিকদা, কমলাদি আর পুঁটুদি ?

চন্দননগরের সঙ্গী নলিনী দাসই বা গেল কোথায় ?

একটা প্রচণ্ড ঝড়ে কে কোথায় চলে গেল, আর কোথায় সে পড়ে রইল এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকূপের অন্ধকারে ! কোথায় এর শেষ ?

মনে পড়ে মায়ের কথা। মা হয়তো অনির্বাণ প্রদীপের মত আজও তাকিয়ে আছেন তাঁর একান্ত প্রিয় মেনির আসা-পথ চেয়ে। জীবনে আর কোনদিন দেখা হবে কিনা কে জানে !

অনুজা ! অনুজা ! অনুজা ! হতভাগ্য অনুজা ! আজ সে পাশে থাকলে আর যা-ই হোক, জীবনটাকে এমন দুর্বিষহ বলে মনে হত না।

আশ্চর্য, অনুজা নেই, অথচ সে আজও বেঁচে আছে ! ভাবতেও যেন অবাক লাগে।

সুশীলেরই বা খবর কি !

মেদিনীপুর জেল থেকে একই সঙ্গে পলাতক সুশীল দাশগুপ্তের কথা তোমার বোধহয় মনে আছে, মল্লিকা। তিনিও তখন একটা গৃহস্থ-বাড়িতে পলাতক জীবন যাপন করছিলেন দীনেশের মত। কিন্তু বেশিদিন নয়। হঠাৎ একদিন সেখানে পুলিস গিয়ে হাজির। আসামী এখানেই রয়েছে। ধরো এবার তাকে।

কিন্তু কোথায় আসামী ! না, কেউ নেই সেখানে। শুধু বাড়ির একটি ভৃত্যকে অদূরে বসে বাসন মাজতে দেখা গেল নিজের মনে। তাছাড়া বাইরের কেউ নেই।

পুলিস বাহিনী অবাক। কি ব্যাপার ! খবর একেবারে পাকা।

তাহলে গেল কোথায় ? নিশ্চয় টের পেয়ে একফাঁকে কেটে পড়েছে। ঠিক আছে, চল ফিরে এবার থানাতে। দেখা যাবে, ক-দিন এভাবে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে থাকতে পারে !

বিশ্বাসঘাতকতা করলেন গৃহস্বামী স্বয়ং। ইঙ্গিতে তিনি দেখিয়ে দিলেন ছদ্মবেশী সেই ভৃত্যটিকে। ঐ তোমাদের আসামী। আদপেই ও ভৃত্য নয়। তোমাদের দেখে ভৃত্যের ভান করেছে মাত্র।

ফলে যা হবার, ঠিক তাই হল। অর্থাৎ,—আসামী মিল গিয়া। চলো এবার থানামে।

বিপ্লবী সুশীল দাশগুপ্তের ঘটনাবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে স্বাধীনতা অর্জনের দিনকয়েক পরেই।

কলকাতায় তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। যে দেশে চিরদিন হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করেছে, রাজনীতি ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে সেদিন তারা দূরে সরে গেছে পরস্পরের কাছ থেকে। শুরু হয়েছে ভ্রাতৃহত্যা।

এগিয়ে এলেন শচীন্দ্রনাথ মিত্র, সুশীল দাশগুপ্ত, স্মৃতীশ ব্যানার্জী প্রমুখ সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তরুণবৃন্দ। অনেক রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, তাকে তোমরা এভাবে কলঙ্কিত করো না। সবাই শান্ত হও। ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ কর। চল ভাই সব নাখোদা মসজিদের দিকে। ওদের আমরা বোঝাব যে, এ দেশ শুধু হিন্দুর নয়, তোমাদেরও। সুতরাং, হানাহানি বন্ধ করে সবাই হাতে হাত মেলাও।

সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া। কেউ আর সেদিন ফিরে আসেননি ওখান থেকে। তাঁদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে সেদিন অক্ষম হয়েছিল ভ্রান্ত মানুষ।

সুশীল আক্রান্ত হয়েছিলেন ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে। ঠিক তার সাত দিন পরে, ১০ই সেপ্টেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে।

বাকি রইলেন দীনেশ। শুধু ভাগ্যদেবতাই বলতে পারে অদৃষ্টে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করে আছে! আশীর্বাদ, না অভিশাপ!

একই ভাবনা তখন দারুণভাবে উদ্বেল করে তুলেছে বন্দিশালায় আবদ্ধ কমলাদির মনকে।

কাজ থাকলে সময়টা মোটামুটি কেটে যায়, কিন্তু কাজ না থাকলেই ভয় করে। যত রাজ্যের পুরনো কথা তখন মনের সামনে ভিড় করে আসে। ফেলে-আসা ছবিগুলো রঙে-রেখায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সব চাইতে বড় ভাবনা—দীনেশবাবু। কষ্টকর হলেও কারাজীবনে একটা স্থায়ী ঠিকানা আছে, সুনির্দিষ্ট আশ্রয় আছে।

কিন্তু দীনেশবাবুর কথা আলাদা। পলাতক জীবন সত্যই বড় দুঃসহ। বড় কঠিন।

জীবন আর মৃত্যুর সেখানে পাশাপাশি বাস। কখন যে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে মৃত্যু এসে হানা দেবে, কেউ তা বলতে পারে না।

বিশেষ করে চন্দননগরের ঘটনার পরে পুলিশ যে তাঁকে এক মুহূর্তও বিশ্রামের অবকাশ দেবে না, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

কোথায় আছেন এখন দীনেশবাবু?

নলিনীবাবু কি যোগাযোগ করতে পেরেছেন তাঁর সঙ্গে?

ছাত্রীসঙ্ঘের অন্যান্য মেয়েরা কি তাঁর সন্ধান পেয়েছে কিছু? পেলে কিছুতেই তারা দূরে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে কেউ-না-কেউ এগিয়ে আসবেই।

আসাই তো উচিত। ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনে দীনেশবাবু আজ বড় নিঃসঙ্গ। বড় একা। এ সময়ে সবার সহযোগিতাই তো আজ সব চাইতে বড় কাম্য।

কমলাদির সেই প্রত্যাশা কিন্তু মিথ্যে হল না, মল্লিকা। সন্ধান পেয়ে অনেকেই সেদিন এগিয়ে এলেন একে একে।

এলেন সুলতা কর। এলেন দুরন্ত দুঃসাহসী মেয়ে আভা দে। এলেন সেই দোতলার মেয়ে কল্যাণী দাস।

দীনেশ শুধু তাঁদের সহপাঠী বা বন্ধুই নন, গুরুও বটে। তাঁকে তাঁরা এভাবে তিল তিল করে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিতে রাজি নন। যে করে হোক তাঁকে বাঁচাতেই হবে। তার জন্য প্রয়োজন হলে ভাগ্যের সঙ্গে, নিয়তির সঙ্গে যুঝতে তাঁরা প্রস্তুত।

সত্যিই তাঁরা যুঝেছেন মল্লিকা। কি না করেছেন সেদিন তাঁরা দীনেশের জন্য!

হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন পরিচয়ে কখনো এখানে, কখনো ওখানে, প্রতিনিয়ত তাঁরা উজান ঠেলে গিয়েছেন নিরলসভাবে। তাঁদের প্রিয় গুরুকে তাঁর যথাযোগ্য গুরুদক্ষিণা দিতে সেদিন কোন-কিছুর ভয়েই তাঁরা পিছিয়ে যাননি।

এ সম্বন্ধে কল্যাণীদি কি লিখেছেন শোন :

'আমাদের ছাত্রীসঙ্ঘে তখন অনেক মেয়ে এসেছে। আমার মা-র প্রতিষ্ঠিত সরলা পুণ্যাশ্রমেও বেশ কিছু মেয়ে তৈরি করেছি। যখন প্রয়োজন ডাক দিলেই হল।

টালিগঞ্জে একটা বাড়ি ঠিক করাই ছিল। একটি ঘর, আর রান্নাঘর।

আশ্রমের একটি মেয়ে সুগতাকে জানালাম,—বোন সেজে একজন পলাতক বিপ্লবীকে নিয়ে তোমাকে থাকতে হবে। প্রস্তুত হও।

তক্ষুণি সে জামা-কাপড় নিয়ে চলে এল। একবারও ভাবল না যে, কত বড় ঝুঁকি সে নিতে চলেছে।

নিজে খ্রীস্টান বড়দিদি সাজলাম। প্রশ্নের উত্তরে ওখানকার সবাইকে জানালাম,—ভাইয়ের যক্ষ্মা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এনেছি। সঙ্গে ছোটবোন থাকবে।

পরে যখন শুনলাম দীনেশবাবুর সত্যই যক্ষ্মা হয়েছে, তখন যে মনে কি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম তা ভাষায় বোঝাবার নয়।

টালিগঞ্জে বেশিদিন থাকা গেল না। এবার তাঁকে নিয়ে আসা হল মুসলমানপাড়া লেনের একটা বাড়িতে। মেছুয়াবাজারের একটা বাড়িতেও রইলেন কিছুদিন। দিনের আলোতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। যেতাম সন্ধ্যার পরে, বৌ সেজে।'

আশ্চর্য, এতটুকুও পরিবর্তন দেখা গেল না দীনেশের মধ্যে। চোখের নিচে সেই ক্লান্তির কালিমা। মুখের রেখায় রেখায় সেই বিষণ্ণ ক্লান্তি।

সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করেন, তবু ঘুম আসে না। মুখটা বিস্বাদ। গায়ে সর্বক্ষণ জ্বর-জ্বর ভাব।

তদুপরি সেই কষ্টকর কাশিটা। কিছুতেই যেন ঐ কাশির হাত থেকে তাঁর রেহাই নেই। তারপরই নির্জীব হয়ে বিছানায় পড়ে থাকেন একটানা অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

কি যেন ভাবেন মনে মনে। দিনে রাতে। অনেক ভাবেন। কিন্তু ভেবে কোন কূল-কিনারা পান না।

শুভার্থীরা অবাক। কি হয়েছে দীনেশবাবুর! বেশ বোঝা যায় কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব ভেতরে ভেতরে তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে। কি ব্যাপার! কি চান তিনি!

টাকা চাই। অনেক টাকা। দু-দশ টাকা নয়, দুশো-পাঁচশো নয়, হাজার হাজার টাকা। কে দেবে আমাকে সেই টাকা?

—আমি দেব। এগিয়ে এলেন গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কের কর্মচারী বন্ধু কানাই ব্যানার্জী, যত টাকা চাও, দেব। শুধু চেক-বইতে আমার কথামত একটা নাম-সই করে দিতে হবে।

—কিন্তু এর ফলে তোমাকে কোন বিপদে পড়তে হবে না তো? ভেবে দেখো!

—আরে না না। আমিই তো রয়েছি। লাখ লাখ টাকার মধ্যে এই সামান্য টাকার কথা কেউ জানতেও পারবে না। দাও, সই করে দাও।

কথামত নাম-সই করে দিলেন দীনেশ। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়। উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ, সেখানে তুচ্ছ ভাবালুতা দেখানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

যথাসময়ে টাকা এসে গেল। অনেক টাকা। মোট সাতাশ হাজার।

তবে বিনামূল্যে নয়। মূল্য দিলেন বন্ধু কানাই ব্যানার্জী। দিব্যি হাসতে হাসতে তিনি চলে গেলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

কোন দুঃখ নেই। ব্যাঙ্কের অনেক টাকা। সামান্য সাতাশ হাজার টাকাতে তার কিছু আসে-যায় না। কিন্তু এদিকের প্রয়োজনটা তো মিটেছে।

অনেক টাকা। দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সবাই। যাক, আর ভাবনা নেই। দীনেশবাবুকে আর এভাবে ভয়াবহ কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে না। এখন সর্বাগ্রে দরকার ভাল চিকিৎসা। ভাল ওষুধপত্তর। কাশিটা ওঁর সত্যিই বেয়াড়া অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে একদিন চন্দননগর থেকে ডাঃ হীরেন্দ্র চ্যাটার্জী এসে দেখে গেছেন। তাঁর অভিমতও তাই। ভাল চিকিৎসা দরকার। দরকার ভাল ওষুধপত্তরের।

কোথায় চিকিৎসা! কোথায় কি!

সেই কঠিন কঠোর নির্মম প্রাত্যহিক জীবন। সেই অভাব অনটন আর করুণ দারিদ্র্য।

বরং কৃচ্ছ্রসাধনের মাত্রা যেন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তার চেয়েও বেশি বেড়ে চলেছে ঐ কষ্টকর কাশিটা। শুধু কাশি কাশি আর কাশি। একটানা কাশি।

এবার অনুযোগ শোনা গেল শুভার্থীদের মুখে। কি এর মানে? কেন এই অহেতুক কৃচ্ছ্রসাধন?

এখন তো আর অর্থাভাবের কোন প্রশ্ন নেই! ওগুলো খরচ করে ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা করলে তো হয়!

খরচ করব! উদ্‌ভ্রান্ত চোখদুটো জ্বলে উঠল দীনেশের, অসম্ভব। ও টাকা পার্টির। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। এবার তা একে একে শেষ করতে হবে। দেহে একফোঁটা রক্ত থাকতে আমি ও-টাকায় হাত দিতে পারব না। আর একটা কথা। আমি আজ আছি, কাল নেই। কখন কি ঘটে যাবে, কেউ বলতে পারে না। সেই সঙ্গে এত কষ্টের টাকাগুলোও যদি বেহাত হয়ে যায়, তাহলে দুঃখের আর সীমা থাকবে না। তাই এগুলো এখন থেকে আপনাদের কাছেই রাখুন ভাই। দেখবেন, এব একটি পয়সাও যেন অহেতুক খরচ না হয়।

কথাটা বলেই এবার একান্ত প্রিয় ছাত্রীদের দিকে টাকাগুলো এগিয়ে দিলেন দীনেশ। সারা মুখে তাঁর নিশ্চিন্ত নির্ভরতার হাসি। তিনি জানেন যে, সংসারে এতখানি নিরাপদ জায়গা তাঁর আর কোথাও নেই।

সবাই চিন্তিত। কি করা যায় এখন! এই কি জীবন! এ-ভাবে কি বাঁচতে পারে কেউ! ইতিমধ্যে সেই হিজলী জেল-পলাতক নলিনীবাবুও এসে গেছেন। এঁদের নিরাপত্তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

ব্যবস্থা হল বর্তমান 'দর্পণা' সিনেমার কাছাকাছি একশো ছত্রিশ বাই চারের এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের একটা বাড়িতে।

স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসার। স্বামী নারায়ণ ব্যানার্জী দলেরই একজন কর্মী। তিনিই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন নিজের নামে। তারই একটি কক্ষে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হল দীনেশ, নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জী বলে অন্য একজন বিপ্লবীর। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা-

দুর্যোগের রাত্রি পেরিয়ে গেছে ওঁদের জীবনের ওপর দিয়ে। এবার ওঁরা একটু শান্তিতে থাকুন।

কোথায় শান্তি, কোথায় কি! সেই কঠিন, কঠোর প্রাত্যহিক নির্মম জীবনযাত্রার মধ্যে শান্তির প্রশ্ন কোথায়?

এই প্রসঙ্গে কল্যাণীদি কি লিখেছেন শোন। এই চিঠি থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে, পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গিয়ে সেদিন কি অপরিসীম মূল্যই না দিতে হয়েছিল ছাত্রীসঙ্ঘের মেয়েদের! কল্যাণীদি লিখেছেন:

'পার্টির প্রয়োজনে সেদিন সই জাল করে গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক থেকে সাতাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হল। আমাদের বাড়িতে বসেই টাইপ এবং সই করা,—টাকা তুলে জমা রাখা ইত্যাদি হল। দীনেশ-বাবুর নির্দেশে টাকাটা মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে রাখা হল।

সুহাসিনী সেন একটি খাঁটি হীরে। তার কাছেই বেশি টাকা রাখা হল। ১৯৩৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ও সব গচ্ছিত টাকা এনে দিল।

যাদুদার (ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়) চিঠি নিয়ে তাঁর প্রেরিত লোক এসে মাঝে মাঝে টাকা নিয়ে যেতেন। বৌদি শ্রীমতী সুধা দাসও নিজেকে বিপন্ন করে স্নেহের দাবিতে কিছু রক্ষা করে-ছিলেন। মহারাষ্ট্র দেশীয় বোন লীলা কামলে সমস্ত শক্তি দিয়ে বিপ্লবী দলকে সমৃদ্ধ করল। দীনেশবাবুকে কি শ্রদ্ধার চোখেই না সে দেখেছিল!

অমিয়া আমার সঙ্গেই জেল থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দিল আমাদের দলে। আবার ধরা পড়ল গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক-এর কেসে। লীলাকেও ধরল। শেষ পর্যন্ত ওকে বহিষ্কার করে দিল বাংলাদেশ থেকে।

সুলতা আট মাস জেল খেটে এসে আবার ধরা পড়ল গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক-এর ব্যাপারে। প্রভাতনলিনীদিকে নিয়ে এলাম আগুনের

পাশে। ধরা পড়লেন। ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে অন্তিম শয্যা নিলেন হাসপাতালে।

শোভারাণী বার্জ-মার্ডার কেসে ধরা পড়ল। ফিরল সেই রাঁচীর পাগলা গারদ থেকে। কি যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই না ওর জীবন শেষ হল।

এমনি আরো কত মেয়েই না এল। বিভা, বনলতা, শান্তি রায়, রমা চৌধুরী, উমা বসু, সুহাসিনী সেন, শান্তিসুধা ঘোষ, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা—এমনি আরো কতজন। বনলতা রিভলবারসহ ধরা পড়ল ডায়োসেশন কলেজ হোস্টেলে। আর ধরা পড়ল জ্যোতিকণা দত্ত। রিভলবারের গুলী পাওয়া গিয়েছিল তার কাছেই। কি অমানুষিক নির্যাতনই না সেদিন সহ্য করতে হয়েছিল জ্যোতিকণাকে, কিন্তু কিছুতেই পুলিস পারেনি তার মুখ থেকে একটি কথা বের করতে। হাজার নির্যাতন সত্ত্বেও না।

আভা দে বহরমপুর জেল থেকে বেরিয়ে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ল। কি ভীষণ জীবন-সংগ্রাম, তবু গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক-এর টাকা আগলে রেখেছিল যক্ষের মত। আমি জেল থেকে ফেরার পরে আর দেখা হল না। জীবনদীপ নিভে গেল। প্রভাতনলিনীদিকেও আর দেখতে পেলাম না।

দীনেশবাবুকে তখন রাখা হয়েছিল কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের একটা বাড়িতে। সঙ্গে আরো দুজন পলাতক বিপ্লবী। নলিনী দাস এবং জগদানন্দ রায়।

দীনেশবাবুকে তখন সত্যিই দুরারোগ্য রোগে ধরেছে, তবু গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক-এর সেই টাকা থেকে একটি পয়সাও তিনি নিজের জন্য খরচ করতে রাজি নন। তাই ভয়ে ভয়ে নিজে থেকেই একপোয়া দুধের ব্যবস্থা করলাম। বীণা, কমলা, সবাই তখন জেলে। মা-বাবাকে লুকিয়ে টিউশনি করি। তাই দিয়ে দুধের ব্যবস্থা।

কতদিন গিয়ে দেখেছি, জ্বরে বেহুঁশ। মাথার কাছে সাবুর বাটি শুকিয়ে পড়ে আছে।

একদিন যেতেই গম্ভীরভাবে বললেন—'দুধের ব্যবস্থা কেন আপনি করেছেন? আমার মত যেখানে যত পলাতক রয়েছে, পারবেন আপনি তাদের সবার জন্য দুধের ব্যবস্থা করতে? তা যদি না পারেন, তাহলে কাল থেকে এসব আর আনতে যাবেন না যেন!'

একটু থেমেই আবার বললেন,—'সমস্ত টাকা রাঁচী গিয়ে যাদুদার কাছে রেখে আসুন।'

আবার সেই কনে বৌ সেজে রাঁচী চলে গেলাম। কিন্তু যাদুদ সে টাকা রাখলেন না। সঙ্গী সহকর্মীকে বললেন,—পুলিস দূ থেকে আমার বাড়ির ওপর ওয়াচ রেখেছে। এক্ষুণি টাকা নিয়ে ফিরে যান।

বুকে করে সেই টাকা নিয়ে ফিরে এসে সোজা চলে গেলা দীনেশবাবুর কাছে। তাঁর নির্দেশে আবার সেই টাকা মেয়েদের কাছে রাখা হল ভাগ করে। দীনেশবাবুর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

পরের কাহিনী সবই তো আপনাদের জানা। ক-দিন বাদে আমিও ধরা পড়েছিলাম পুলিসের হাতে।'

'ঝড়ের গর্জন মাঝে বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল।'

এদিকে তখন তৎপর হয়ে উঠেছে পুলিস। ভয়ানক তৎপর।

বিশেষ করে চন্দননগরের ঘটনার পর থেকেই তাদের তৎপরতা যেন শতগুণে বেড়ে গেছে। হন্যে হয়ে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে সর্বত্র। যে-কোন মূল্যে, জীবিত বা মৃত দীনেশ মজুমদারের শির চাই।

অদ্ভুত ক্ষমতা লোকটার। হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও লোকটা প্রতিবারই বেড়াজাল টপকে বেরিয়ে গেছে। এবার যেন কোনরকমেই সে এড়াতে না পারে।

ঘুম নেই বিদেশীর পদলেহী ঘৃণ্য গুপ্তচরদের চোখেও। উঠতে-বসতে ধমক খেয়ে খেয়ে প্রাণ তাদের ওষ্ঠাগত।

সন্ধান অবশ্য ইতিমধ্যে তারা অনেকবারই এনে দিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কোন কাজেই লাগেনি। যেন ম্যাজিক জানে লোকটা।

তবে যাবে আর কোথায়! আজ হোক, কাল হোক, ধরা তাকে পড়তেই হবে।

সম্প্রতি অবশ্য নতুন একটা খবর কানে এসেছে। বেশ পাকা খবর বলেই মনে হয়। দেখা যাক কি হয়!

১৯৩৩ সালের ২২শে মে। ভোর তখন প্রায় পাঁচটা।

ইতিমধ্যে মাসখানেক প্রায় কেটে গেছে। দীনেশের শরীর সেই আগের মতই আছে। কাশিটা কমেনি। ঘন ঘন কাশির বেগ তখনো তাঁকে মাঝে মাঝেই দিশেহারা করে তোলে।

সেদিন ভোরের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল দীনেশের।

সেই প্রাণান্তকর কাশি। কাশি থামতেই জানলা দিয়ে কি দেখে মুহূর্তে অলস দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তাঁর।

কে? কে? আবছা আবছা আলোতে ভাল করে দেখা না গেলেও চিনতে এতটুকুও ভুল হয় না।

পুলিস! অসংখ্য পুলিস! সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী ইতিমধ্যে গোটা বাড়িটাকে ঘেরাও করে ফেলেছে।

অসুস্থতা সত্ত্বেও শেষবারের মত দপ্ করে জ্বলে উঠলেন দীনেশ। নলিনী! জগদা! রেডি প্লীজ! কুইক! কুইক!

ইয়েস, রেডি। চোখের পলকে প্রস্তুত হয়ে নিলেন তিনজন। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সৈনিক তাঁরা। চোখের সামনে বিরাট পুলিস-বাহিনী, তবু আত্মসমর্পণ কোনমতেই নয়। রক্তের বদলে রক্ত। লাইফ ফর লাইফ। এই তাঁদের নীতি।

—ঝামেলা করে কোন লাভ নেই। নিচ থেকে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ পুলিস ইন্‌সপেক্টর মিঃ ভট্টাচার্যের ভারি গলা ভেসে এল, ধরা দেবে কিনা বল? জবাব দাও।

জবাব দিল একসঙ্গে তিনটি অগ্নিবর্ষী রিভলবার,—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

প্রত্যুত্তর এল ভারি পাল্লার রাইফেলের শব্দ,—ড্রাম! ড্রাম! গড়াম! কটাক! ক্রিক! ড্রাম! ড্রাম!

নিমেষে জেগে উঠল গোটা ঘুমন্ত পল্লীটা। আধো আধো চেতনায় প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় নিল। পরে আর কিছুই অজানা রইল না।

ব্যাপার দেখে অজ্ঞাতেই কখন তাদের বুক ঠেলে বেরিয়ে এল অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি। সাবাস! সাবাস! পরাধীন জাতির ইতিহাসে তোমাদের তুলনা নেই।

এদিকে ইতিহাস তখন এগিয়ে চলেছে পূর্ণগতিতে।

একদিকে সশস্ত্র বাহিনী, অন্যদিকে তিনটি মাত্র ভয়লেশহীন যুবক।

একদিকে হাঁটু মুড়ে পোজিশন নিয়েছে অগণিত পুলিস-বাহিনী, অন্যদিকে মাত্র দীনেশ, নলিনী ও জগদানন্দ।

এক দলের হাতে দুরপাল্লার শক্তিশালী রাইফেল, অন্য দলের স্বল্পপাল্লার রিভলবার মাত্র ভরসা।

—শুধু শুধু প্রাণ দিয়ে লাভ নেই। আবার ভারি গলা শোনা গেল, বাঁচতে চাও তো এখনো আত্মসমর্পণ কর!

ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! নলিনী তুমি বাঁদিকের জানলাটা সামলাও। জগদা, শীগ্‌গির বাক্স থেকে গুলীর প্যাকেটটা বের করে দাও। আমি এদিক সামলাচ্ছি। ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

ড্রাম! ড্রাম! কটাক! ক্রিক! ড্রাম! ড্রাম! দু পক্ষই সমান। কেউ কম যায় না। গুলীর শব্দে কান পাতা দায়।

বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে। দুহাত দূরের জিনিসও ভাল করে চোখে পড়ে না। তবু তারই মধ্য দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে চলেছে জ্বলন্ত সীসের গুলী। একটু অসতর্ক হওয়া মানেই মৃত্যু।

—রেডি নলিনী। ওরা গেট দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করছে। চালাও। চালাও। চার্জ! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! হুঁশিয়ার! কেউ যেন ঢুকতে না পারে। সমানে চালিয়ে যাও।

—এখান থেকে পোজিশনটা খুব ভাল পাচ্ছিনে দীনেশ। মনে হয়, ছাদে যেতে পারলে কিছুটা সুবিধে হত।

—ছাদে! কথাটা মন্দ বলনি। ঠিক আছে, তুমি আর জগদা ঝট্‌পট্ উঠে যাও। ততক্ষণ আমি ওদের ঠেকিয়ে রাখছি। তোমরা গিয়ে পোজিশন নিলেই আমি চলে আসব। জগদা, গুলীর বাক্সটা সঙ্গে নাও।

নিমেষে ছাদে পৌঁছে গেলেন নলিনী ও জগদা। পৌঁছে গেলেন দীনেশও। তারপরই আবার লড়াই শুরু হল নতুন উদ্যমে।

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! কিন্তু না, সুবিধে হচ্ছে না। ছাদের কার্নিশের আড়ালে অনেকটাই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

মনে হয়, পাশের বাড়ির ছাদে গিয়ে পোজিশন নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এতটা দূরত্ব ডিঙিয়ে যাওয়া যে অসম্ভব।

মোটেই অসম্ভব নয়। নিমেষে এক অসমসাহসিক কাণ্ড করে বসলেন বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় নলিনী দাস। উদ্যত রিভলবার হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিরাট এক লাফ মেরে তিনি ছিটকে গিয়ে পড়লেন পাশের বাড়ির ছাদের ওপর। তারপরই মনের আনন্দে আগুন ছড়াতে লাগলেন একটানা।

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! কাম অন্। মরতে ভয় পাইনে। তা বলে তোমাদেরও রেহাই দেব না। কাম অন্! সাহস থাকে তো এগিয়ে এস।

সাবাস নলিনী, সাবাস! চালিয়ে যাও। সাধ মিটিয়ে চালিয়ে যাও। এমন সুযোগ আর পাবে না। জগদা, গুলীর বাক্সটা এগিয়ে দাও। কুইক!

কিন্তু একি! ওরাও যে আশে-পাশের বাড়ির ছাদে উঠে গেছে এরই মধ্যেই! কুইক জগদা, কুইক! নলিনী, বাঁদিকে তাকাও।

—কোন লাভ নেই তাকিয়ে। ভারি গলা ভেসে এল অন্য একটি বাড়ির ছাদ থেকে, কেউ রেহাই পাবে না আজ। চেন না তো ইংরেজ বাহাদুরকে!

—বেইমান! ফুঁসে উঠলেন দীনেশ, এদেশের লোক হয়ে তুমি এসেছ কিনা তোমার দেশবাসী ছেলেদের গ্রেপ্তার করতে? দাঁড়াও, তোমার বেইমানী ঘুচিয়ে দিচ্ছি আজ। ড্রাম! ড্রাম!

—আঃ! তেওয়ারী, শীগ্‌গির ধর আমাকে! শেষ করে দিয়েছে একেবারে। নামিয়ে দে, শীগ্‌গির নিচে নামিয়ে দে আমাকে!

শুরু হল এক নতুন অধ্যায়: দীনেশ উন্মত্ত, মরীয়া, বেপরোয়া। নলিনী, জগদানন্দও তাই। চালাও। চালাও। সৈনিক জীবনে মৃত্যু তো ছেলেখেলা মাত্র। তার জন্য তাঁরা প্রস্তুত।

তা বলে ভীরুর মত আত্মসমর্পণ কোনমতেই নয়। ব্লাড ফর ব্লাড। এ ছাড়া আর কোন নীতি নেই।

কিন্তু একি! সহসা কি দেখে চমকে উঠলেন জগদানন্দ, তোমার কাঁধে এত রক্ত কেন দীনেশ? ঈস্! রক্তে একেবারে ভেসে গেছে যে! লেগেছে নাকি?

—হবে হয়তো। হাসলেন দীনেশ, টেরও পাইনি কিছু। তা তোমার পিঠেও তো প্রচুর রক্ত দেখছি! কখন লাগল?

—কি জানি! তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিলেন জগদানন্দ, লেগেছে হয়তো কখনো। ডানদিকে দীনেশ, ডানদিকে। কুইক! কুইক! ড্রাম! ড্রাম!

পাশের ছাদ থেকে নলিনী দাসও তার প্রতিধ্বনি তুললেন,—

ড্রাম! ড্রাম! হুঁশিয়ার দীনেশ! ওরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। ভেরি কেয়ারফুল! ড্রাম! ড্রাম!

দেখতে দেখতে পুলিসে ভরে গেল গোটা ছাদটা। হাতে তাদের উদ্যত রাইফেল। পাশের বাড়ির ছাদেও দেখা গেল সেই একই দৃশ্য। শুধু পুলিস, পুলিস আর পুলিস!

ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! কটাক! ক্রিক! ক্রিক! ড্রাম! জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি মুহূর্ত। একদিকে তিন অগ্নিশিশু, অন্যদিকে বিরাট সশস্ত্র-বাহিনী। বেষ্টনী ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ। তবু তাঁরা বেপরোয়া। আত্মসমর্পণ কিছুতেই নয়।

কিন্তু একি! দীনেশের রিভলবার হঠাৎ নিঃশব্দ কেন? জগদানন্দই বা চুপ কেন?

কারণ সেই একই মল্লিকা। অগ্নিযুগের যুবক-যুবতীদের সেই চিরন্তন সমস্যা। অর্থাৎ, গুলী শেষ। আর একটি গুলীও অবশিষ্ট নেই।

বলা বাহুল্য যে, এতবড় সুযোগটা আর কোনমতেই হাত-ছাড়া করল না পুলিস-বাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে তারা এবার বীরদর্পে ঝাঁপিয়ে পড়ল দীনেশ ও জগদানন্দের রক্তাক্ত দেহের ওপর।

বাকি রইলেন নলিনী দাস। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সহসা তিনি তরতর করে নিচে নেমে পড়লেন জলের পাইপ বেয়ে। কিন্তু সব বৃথা। সেখানেও পুলিস। পালাবার পথ নেই।

খবর শুনে উল্লাসে মেতে উঠল গোটা শ্বেতাঙ্গ শাসক-সমাজ। গড সেভ দি কিং! রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে আবার খাঁচায় বন্ধ করা হয়েছে। অনেক জ্বালিয়েছে লোকটা। এবার তার প্রতিশোধ নিতে হবে। উপযুক্ত প্রতিশোধ।

আর দেশবাসী! চোখে-মুখে তাদের চাপা উদ্বেগ। গত তিন বছরে এমনি কতজন তাদের চোখের সামনে থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। এবার বোধহয় দীনেশের পালা। অদৃষ্টে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করে আছে কে জানে!

অপেক্ষা আর বেশিদিন করতে হল না। শুরু হল বিচার।

এক এক করে অনেক অভিযোগই আনা হল দীনেশের বিরুদ্ধে একটার পর একটা। জেল থেকে পলায়ন, কুঁই-হত্যা, গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক প্রতারণা, পুলিস কর্মচারীকে আঘাত করা, কিছুই বাদ গেল না।

তবে আসল অপরাধ তাঁর একটাই। সে অপরাধ হল, দেশের মুক্তি-কামনা। পরাধীন জাতির পক্ষে এর চাইতে বড় অপরাধ আর কিছুই নেই। সুতরাং মহামান্য আদালত রায় দিলেন,---প্রাণদণ্ড। নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

দীনেশ নির্বিকার। সারামুখে তাঁর নিরুদ্বেগ জীবনের সুপ্ত প্রশান্তি।

স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিতে হয়। চরম মূল্য দিয়ে বন্ধু অনুজা আগেই চলে গেছে। এবার তার পালা। আর কোন কাজ নেই। কেবল অপেক্ষা। শেষ-বিদায়ের আগে কয়েকটা যন্ত্রণাময় দিন। সেগুলো পার হবার জন্য এক ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা।

নির্জন কারাকক্ষে বসে দীনেশ তাঁর জীবনের শেষ-নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন দাদা অবিনাশ মজুমদারকে।

আশ্চর্য, সেখানেও প্রতি ছত্রে ছত্রে পরোক্ষভাবে রয়েছে শুধু অনুজারই কথা। বন্ধু অনুজা তাঁর সমস্ত চেতনাকে আছন্ন করে রেখেছিলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। চিঠিটা তোমাকে শোনাচ্ছি মল্লিকা ঃ

'শ্রীচরণেষু –

পয়লা বোশেক্ শনিবার। নতুন বছর আসবে বলেই বুঝি বুধবার রাত্রিতে এবারের প্রথম বৃষ্টি এসে সব কিছু ধুয়ে-মুছে দিয়ে গেল। একদিনের বৃষ্টিতেই যেন পৃথিবীর রঙ, গন্ধ বদলে গেল।

হাওয়ার গর্জন এসে বাজে কানে। বুঝি কালবোশেখীর হাওয়া। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে আজ মনটা তেমনিভাবে নাচতে চাইছে না, যেমন নেচে উঠত আগে, কত সব না-বলে-চলে-যাওয়া বন্ধুদের জন্য। কত বিদায়-দিতে-না-চাওয়া বন্ধুর জন্য।

আজ ঝোড়ো হাওয়ার ভিতরেও এক শান্তি, গভীরতর শান্তি দেখছি, গর্জনের ভিতরেও এক নীরব শান্তিভরা সুর শুনছি। দারুণ কোলাহল, কতরকম আওয়াজের ভিতরেও যেন সেই এক সুর এসে বাজছে কানে, ঝঙ্কৃত হচ্ছে হৃদয়ের তারে তারে।

আজ নববর্ষে তোমাদের প্রণাম করছি সকলকেই, ছোটদের ভালবাসা জানাচ্ছি।

ইতি দীনেশচন্দ্র মজুমদার।'

অবশেষে এল সেই ১৯৩৪ সালের ৯ই জুলাই। পৃথিবী থেকে দীনেশের শেষ-বিদায় নেবার দিন।

আরো আগই হত, হতে পারেনি দীনেশের অসুস্থতার জন্য। গায়ে সর্বক্ষণ দু-তিন ডিগ্রি জ্বর লেগেই রয়েছে। তদুপরি সেই মারাত্মক কাশি।

গতকাল থেকে জ্বরটা সামান্য কমেছে। সুতরাং আর দেরি নয়। দাও এবার ঝুলিয়ে।

জেল-গেটের বাইরে অগণিত অপেক্ষমান জনতা। এসেছেন নামী জননায়কগণ। এসেছেন আত্মীয়-পরিজনবৃন্দ। সহকর্মীদের মধ্যেও এসেছেন কেউ কেউ।

শুধু আসেননি কমলাদি। তিনি তখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

কিন্তু সব বৃথা। হিন্দুমতে শেষকৃত্য করার জন্য শবদেহ ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাজি হলেন না সুসভ্য ইংরেজ শাসককুল। অথচ নিয়ম তাই: সচরাচর তাই দেওয়া হয়।

শুধু তাই নয়। মৃত্যুর পূর্বে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আত্মীয়-পরিজনকে শেষ-দেখার সুযোগ পর্যন্ত এক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি। বিশ্বাস কি! যে মারাত্মক বিপ্লবী! সব্যসাচীর মত আঙুলের ফাঁক গলে আবার চলে যেতে কতক্ষণ!

দীনেশ চলে গেলেন। শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালেন দেশের কোটি কোটি নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষ। চোখে তাদের বিষণ্ণ কাতর দৃষ্টি। বুকে আগুনের ফুল্‌কি। আমরা ভুলব না। শহীদ দীনেশকে আমরা কোনদিনও ভুলব না।

রুদ্ধকারার নির্জন কক্ষে বসে একদিন কমলাদিও শুনলেন সে-খবর।

আশ্চর্য, শুনে একটি কথাও বললেন না তিনি। শুধু দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিলেন দূরে, বহু দূরে, আকাশের দূর দিগন্তে।

নেই। নেই। সহকর্মীদের মধ্যে একদিন যিনি ছিলেন সবচাইতে কাছের মানুষ, সেই সহপাঠী, বন্ধু ও গুরু দীনেশবাবু আর নেই।

সবই যেমন ছিল তেমনিই আছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সব চলবে অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে। শুধু দীনেশ-বাবুই আর কোনদিন ফিরে আসবেন না।

কত ভাবনা, কত সংশয়, কত ভয়, আজ সব ধুয়ে-মুছে একাকার। সব বেদনার আজ ইতি। সব কিছুর পরিসমাপ্তি।

কত কথা বলার ছিল, জানার ছিল কত কথা, কিছুই আর করা হল না এ জীবনে।

আবার ধীরে ধীরে একসময়ে আত্মস্থ হয়ে ওঠেন কমলাদি।

না না, কোন দুঃখ নয়। চোখের জল ফেলাও নয়।

কিসের দুঃখ! এই তো সত্যিকার মূল্য। এমনি মূল্যই তো দিতে হয় স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য।

ঐ ধ্যান-গম্ভীর হিমালয়ের মতই তিনি শুভ্র, পবিত্র ও মহান। তাই তো তিনি নিজেকে এমন করে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন দেশের প্রয়োজনে। হে বাংলার দধীচি, তোমাকে শতকোটি নমস্কার!